বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০১

১ম প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৮
অগ্রহায়ণ	১৪১৪
ডিসেম্বর	২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISSHAS O ATTOUNNOYON by Kazi Md. Mortuza Ali. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 120.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস	৯
বিশ্বাস ও বুদ্ধিমত্তা	১৮
বিশ্বাস ও ইসলাম	৩০
জীবনদর্শন ও ইসলাম	৪৪
ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা	৫৮
আল কুরআন ও বিশ্বাস	৬৬
বিশ্বাস ও বিধিলিপি	৭৮
বিশ্বাসের ভিত্তিমূল	৮৭
মানব উন্নয়নে ইসলামী শরীয়াহ্‌র ভূমিকা	৯৬
বিশ্বাস ও বিশ্বমানবতা	১০৫
বিশ্বাস ও বাস্তবতা	১১১
বিশ্বাস ও নৈতিকতা	১২১
বিশ্বাসীদের গুণাবলী	১২৮
বিশ্বাস ও সৎকর্ম	১৩৮
বিশ্বাস ও সরল পথের দিশা	১৫০
বিশ্বাস ও জীবনাচরণ	১৫৫
বিশ্বাস ও ইবাদাত	১৭০
বিশ্বাস ও সুখ	১৭৯
বিশ্বাস ও সংগ্রাম	১৮৬
জ্ঞান ও বিশ্বাসের গভীরতা	১৯৩
বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন-১	২০৩
বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন-২	২১২

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস

যারা বিশ্বাসী নয় তারাই অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোনো বাস্তব প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম। যেহেতু প্রমাণ নেই সেহেতু বিশ্বাস স্থাপনও অযৌক্তিক। বিশ্বাসী নয় এমন অনেকে আবার সংশয়বাদী। সংশয়বাদীরা বলে থাকে যে, সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে মানব মনের বোধগম্য নয়। অতএব তা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদীদের এসব যুক্তির বিপরীতে বিশ্বাসীদের বক্তব্য যে, কোনোরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই বিশ্বাসস্থাপন করা যায় শুধুমাত্র বিচার-বুদ্ধির বিশ্লেষণের দ্বারা। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য কোনো প্রমাণ নবী-রাসূলগণ হাজির করেননি এবং তারা কখনো দাবি করেননি যে, তাদের নিকট প্রমাণ রয়েছে। বরং তারা দাবি করেছেন যে, তাদের নিকট জ্ঞানের একটি উৎস রয়েছে যা সাধারণ মানুষের নিকট নেই। তারা এও বলেছেন যে, তাদের বক্তব্য কল্পনা নির্ভর নয়। তাদের নিকট যে জ্ঞান এসে থাকে তারা শুধু তাই বলেন। মনগড়া কিছু তারা বলেন না। মানুষ যদি তাদের কথা বিশ্বাস করে তবে তাতে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষ, নবী-রাসূলগণের কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়েছে। এ বিশ্বাসের পেছনে তাদের কারণ হচ্ছে, নবী-রাসূলগণ ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। মিথ্যা দাবি করার কোনো কারণ ছিল না এবং দাবির পেছনে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের কোনো প্রয়াস মনে হয়নি। নবী-রাসূলগণের বক্তব্য অসংগতিপূর্ণ ছিল না। বরং তাদের আদেশ-নির্দেশের মধ্যে মানব কল্যাণের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

মানব সভ্যতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অবিশ্বাসীদের ক্রমবিকাশবাদের বিপরীত। কুরআন বলছে যে, দুনিয়ায় মানুষের আবির্ভাব অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে হয়নি। বরং আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের আলোকে হয়েছে। আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আ.-কে দুনিয়ায় বসবাস করার উপযোগী জ্ঞান দান করে পৃথিবীতে পাঠালেন। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিশ্বাসের বাণী নিয়ে নবীদের মাধ্যমে কিতাব নাযিল হয়েছে। নবী মুহাম্মদ স.-এর নিকট সর্বশেষ যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তা বিকৃত বা

www.amarboi.org

পরিবর্তিত হবার কোনো আশংকা নেই। তেমনি কুরআনকে নিশ্চিহ্ন করার কোনো উপায় নেই। তথাপি কুরআনকে অবিশ্বাসীরা সত্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করে না। সংশয়বাদীদের মনেও রয়েছে সন্দেহ। ফলে বুদ্ধি-বৃত্তিক সত্যকে তারা মেনে নিতে পারেনি। অবিশ্বাসের এই কুপমণ্ডুকতা থেকে জড়বাদী ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছে। অবিশ্বাসীরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনো অদৃশ্য সত্যকে স্বীকার করে না। ইহকালকেই চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করে। পার্থিব জীবনে সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া মানবজীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে অবিশ্বাসীরা মনে করে না। ফলে সুবিধাবাদী ও ভোগবাদী জীবনদর্শন অবিশ্বাসীদের মনের মণিকোঠায় আসন নিয়ে থাকে। অন্যদিকে অদৃশ্য শক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর উপাসনা বিশ্বাসীদের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চেতনা হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

"আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

ইবাদাত বা উপাসনার সাথে আনুগত্যের প্রশ্ন জড়িত। মানুষ একজনের আনুগত্য করবে এবং অন্যজনের উপাসনা করবে এ ধারণা অযৌক্তিক ও অসংগতিপূর্ণ। অতএব বিশ্বাসীরা এক আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করে থাকেন। অবিশ্বাসীরা অদৃশ্য শক্তির আনুগত্য বা উপাসনা করে না। তাদের দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ "তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। তাদের দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু দেখে না, তাদের শ্রবণশক্তি আছে কিন্তু শোনে না। তারা হচ্ছে পশুর মত বরং তার চেয়েও অধিক ভ্রষ্ট। এরাই গাফেল।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯ পবিত্র কুরআনে অংশীবাদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا اَنَّ الْقُوَّةَ
لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা গ্রহণ করে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে অংশীরূপে ও তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহর মত, কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তারা আল্লাহকে ভালবাসে সর্বাধিক। যালিমরা যদি শাস্তি

www.amarboi.org

প্রত্যক্ষের আগেই বুঝতে পারতো যে, সমস্ত শক্তির কেন্দ্র আল্লাহ এবং আল্লাহই কঠিন শাস্তিদাতা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৫

অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّ
بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

"কাফেরদের উপমা সেই ব্যক্তির মত যে চিৎকার করতে থাকে অথচ নিজে শুনতে পায় না হাক-ডাক করা না হলে। এরা বধির, মূর্খ ও অন্ধ সুতরাং কিছুই বুঝে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭১

পাশাপাশি প্রকৃত বিশ্বাসীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে এভাবে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ
فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ ○

"কোনোই পুণ্য নেই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে। কিন্তু প্রকৃত পুণ্য হলো যে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, সকল কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্য তারা সম্পদ ব্যয় করে প্রতিবেশী, এতিম, মিসকীন, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীদের জন্য এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য, আরো তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং ধৈর্যধারণ করে দুঃখে, কষ্টে ও যুদ্ধের সময় তারাই সত্য পথের উপর কায়েম রয়েছে এবং তারাই মুত্তাকী (প্রকৃত বিশ্বাসী)।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

www.amarboi.org

অবিশ্বাসীদেরকে দৃষ্টিশক্তিহীন, বাকশক্তিহীন এবং শ্রবণশক্তিহীন মানুষের সাথে তুলনা করার পরে বিশ্বাসীদেরকে সৎ মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ বিশ্বাসীদের সৎ ও সুন্দর হতে বলেছেন, কারণ বিশ্বাসীরা আল্লাহর বন্ধু। বন্ধু হিসেবে আল্লাহ তাঁদেরকে সুপথের দিকনির্দেশ দিয়েছেন। এ পথকে বলা হয়েছে আলোর পথ। অথচ অবিশ্বাসীরা আলোর পথ পরিহার করে অন্ধকারের দিকে ধাবমান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"আল্লাহ বিশ্বাসীদের পরম বন্ধু, তিনি তাদেরকে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং অবিশ্বাসীদের অভিভাবক হলো শয়তান, সে তাদেরকে নিয়ে যায় আলোক থেকে অন্ধকারের দিকে। তারা জাহান্নামী হবে এবং সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭

অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নয় এ কারণে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না। অবিশ্বাসীরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের জন্য মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব তাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন ভয়ংকর ও মর্মন্তুদ শাস্তি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ط اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

"যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফুরী ক্রয় করেছে কখনও তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। কাফেররা যেন মনে করে না তাদের অবসর দান কল্যাণকর। আমি তাদেরকে শুধু এজন্য অবসর দিচ্ছি যেন তারা পাপের সঞ্চয় বাড়িয়ে নেয় এবং তাদের জন্য আছে লজ্জাকর শাস্তি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৭-১৭৮

www.amarboi.org

আখিরাতে শাস্তির ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের কোনো ভীতি নেই কারণ তারা আখিরাতকে অস্বীকার করে থাকে। অবিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ○ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

"যারা কুফরী করেছে এবং যুলুমও করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং অন্য কোনো পথ দেখাবেন না জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহর জন্য এটা সহজ ব্যাপার।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৬৮-১৬৯

অবিশ্বাসীরা আখিরাতকে সত্য বলে মনে করে না। তারা মনে করে এটি অসম্ভব এবং অবাস্তব। যুক্তি ও বিশ্বাসের অযোগ্য এবং কল্পনারও অতীত। কিন্তু বিশ্বাসীরা জানেন যে, আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। ভালো ও মন্দের ব্যাপারে সঠিক মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে শুধুমাত্র আখিরাতের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে। পার্থিব সুখ ও সম্পদের মোহ মানুষকে এত বেশী আকৃষ্ট করে থাকে যে, তা কাটিয়ে উঠবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনে সূরা আন নাবায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মানুষকে একদিন হাশরের ময়দানে হাজির করা হবে। সেদিন মানুষের নিকট হিসাব চাওয়া হবে। কারণ এ বিশাল জগত শুধু তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক। ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর মর্জিমত চলেছে কি না তা অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার কর্মের বিচার করা হবে। অবিশ্বাসীরা তখন তাদের কর্মের হিসাব দেখে চিৎকার করে বলে উঠবে,

يَٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًا ○

"হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!"–সূরা আন নাবা ঃ ৪০

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন যে, মানুষ কোন্ যুক্তিতে কিয়ামত বা পরকালকে অসম্ভব মনে করছে ? এর জন্য তো একটা বড় রকমের ভূমিকম্পই যথেষ্ট। আরও প্রশ্ন রাখা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন, না চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের এ বিশাল জগত

www.amarboi.org

সৃষ্টি করা কঠিন। বিশ্বাসীরা মনে করেন আল্লাহর পক্ষে কোনোটিই কঠিন নয়। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তা জানে না। তারা প্রশ্ন করে এই বলে যে, কিয়ামত যদি সত্যিই সংঘটিত হবে তবে তা আসছে না কেন, কিংবা কখন হবে তা বলা হচ্ছে না কেন ? পবিত্র কুরআনে এর জবাব বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের দিন তারিখ জানার কোনো দায়িত্ব রাসূলকে দেয়া হয়নি এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো তা জানা নেই। তবে কিয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী এ বিষয়ে সাবধান করা রাসূলের দায়িত্ব। মানুষকে জোর করে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী করার দায়িত্বও রাসূলের ছিল না। মানুষ ইচ্ছা করলে পরকালের বিচারের ভয়ে নিজেকে সংশোধন করতে পারে। কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না এবং সংশোধিত হবে না তারা যখন দেখবে যে, কিয়ামত এসে গেছে তখন তারা উপলব্ধি করবে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে তারা কি বোকামি করেছে। কিন্তু শেষ বিচারের দিন অবিশ্বাসীদের এ উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে না। তাই কারও এমন ধারণা করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয় যে, সে যতই মন্দ কাজ করুক তাকে প্রশ্ন করার কেউ নেই। এ পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হবার বা যা ইচ্ছা তাই করার প্রবণতা সঠিক নয়, এ উপলব্ধি আনাটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

পবিত্র কুরআনে মানুষকে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্মজীবন কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে এবং আখিরাতে মানুষ জানতে পারবে যে, সে দুনিয়ায় থাকাকালে কি কি কাজ করেছে এবং তার মৃত্যুর পরেই তার কাজের হিসাব শেষ হয়ে যায় না। চূড়ান্ত বিচারের দিন মানুষ জানতে পারবে চূড়ান্ত হিসেবে কি জমা হয়েছে। একজন বিপথগামীকে অনুকরণ করে যারা বিপথগামী হবে তাদের কাজের জন্যও নেতার বিপথগামী ভূমিকা অনুযায়ী তার বিচার হবে। পুণ্যবানদের হিসেবেও জমা হবে অসংখ্য পুণ্য যা তাদের প্রভাবে সমাজে অন্যান্যরা অনুসরণ করেছে। প্রতিটি পুণ্য কাজ এবং সমাজে এর প্রভাবের ভিত্তিতেই সমাজপতিদের কাজের বিচার হবে। অতএব এ ব্যাপারে সচেতন থাকা যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকবান মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী। সমাজের নেতৃত্ব যারা দিতে চান তাদের আচরণ হতে হবে সুন্দরতম। সুন্দরতম আচরণের অধিকারী হবার জন্য বিশ্বাস প্রধানতম শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

পরকালের প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে সত্য উপলব্ধি করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আখিরাতে যে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে সে কথাকে মিথ্যা মনে করার ফলেই মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা দুনিয়ার জীবনকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করে এবং নিজেদের মনগড়া মত ও পথে দুনিয়ার সুখ-সুবিধা নিয়ে মত্ত থাকে। অবতীর্ণ বিধি-বিধান তাদেরকে বল্গাহীন ভোগের পথে বাধা দেয় বলেই তারা

www.amarboi.org

ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখাকে নিরাপদ বলে মনে করে। কিন্তু মানুষ আল্লাহ ও আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার সুখ-সম্পদের জন্য যত পরিশ্রম করুক না কেন আল্লাহর অমোঘ আইনে তাকে একদিন হাজির হতে হবে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট। সেখানে হাজির হবার পর মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। আর অন্যদল আমলনামা পাবে বাম হাতে। এরা হবে জাহান্নামবাসী। কর্মফলের ভিত্তিতে মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা মানুষকে সৎ ও সুন্দর হতে সাহায্য করে।

মানুষকে দুনিয়ার জীবনে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নিজের খেয়াল খুশীমত চলার স্বাধীনতা অবশ্যই দেয়া হয়েছে। মন্দ কাজ করার সাথে সাথেই যদি মানুষ শাস্তি পেত তবে কারো পক্ষেই আর মন্দ কাজ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এমন হলে মানুষকে পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু সেই সাথে বিবেক দিয়েছেন। মানুষের এ স্বাধীনতাকে যদি অন্যায় কাজ করার অনুমোদন মনে করা হয় তবে তা নিশ্চয় চরম মূর্খতা। তাই নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যে নিজের হিসাব নিজে নেয় এবং যাকিছু করে তার ফল মৃত্যুর পর কি পাবে সেই হিসাব করেই তা করে।" কিন্তু মানুষ নগদ যা পায় তাতেই লালায়িত হয়। নগদ কামনা-বাসনার বিনিময়ে বা পরিণামে যে বিরাট ক্ষতি হবে তা বিবেচনা করা হয় না।

ভালো ও মন্দ বাছাই করার যোগ্যতা সত্ত্বেও মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বা অন্য মানুষের কুপরামর্শে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে। পৃথিবীর বস্তুগত সুখ-শান্তিকে তারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করে। তাদের ধারণা পৃথিবীতে ধন-সম্পদের পরিমাণ মানুষের মান-সম্মানের একমাত্র নিয়ামক। ফলে মানুষ নিজেদেরকে অর্থ উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে তৈরী করে। মানবীয় গুণাবলী মানুষের নিকট থেকে দূরে সরে পড়ে। মানুষ ক্রমশ পরিণত হয় পশুতে। বস্তুত আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে ভোগ করাই হলো পশুত্ব।

মানবীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে মানুষ যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে তা ইবাদাত বলে গণ্য হয়। মানুষ ভুলে যায় যে, ভোগে মত্ত থাকলে মানুষ সাধনার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। মানব জীবন সার্থক হয়ে উঠে ত্যাগের মাধ্যমে। মানুষ ভুলে যায় যে, একদিন সব ধন-সম্পদ ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে শূন্য হাতে। পার্থিব সম্পদ যে আখিরাতে মানুষের কোনো কাজে আসে না এ সত্যটুকু যদি মানুষ ঠিক মত বুঝতে পারে—

www.amarboi.org

তাহলে সত্য পথে চলা তার জন্য কঠিন মনে হয় না। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের বিবেক মরে যায়। তাদের স্বভাব এমন হয়ে যায় যে, সৎগুণকে সৎ বলে মনে করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে। অন্যায় পথে চলাটাই তাদের নিকট সহজ মনে হয়। বিবেক আর দংশন করে না। কলুষিত সামাজিক পরিবেশ তাকে কুপথে চলার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু সমাজের পংকিলতার মধ্যেও যাঁরা বিশ্বাসী এবং সৎ জীবনযাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আল্লাহ তাদেরকে সৎ পথে চলা সহজ করে দেন।

আল্লাহ মানুষকে ভালো ও মন্দ পথ চেনার মত বিবেক দেয়ার সাথে সাথে মানুষকে সুপথ কোন্‌টি তা বলে দিয়েছেন এবং এ কারণেই তিনি কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের মালিক। মানুষ যদি আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া চায় তবে তা দেয়ার মালিক তিনি। আর যদি আখিরাত চায় তবে তা অর্জন করতে হবে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে। মানুষকে বাছাই করে নিতে হবে কোন্ লক্ষে সে ধাবিত হবে। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তা বুঝার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে এবং আল্লাহ নিজেও কোন্ পথটি সহজ, সরল ও সঠিক তা বলে দিয়েছেন। এর পরেও যদি মানুষ বিপথগামী ও অবিশ্বাসী হয় তবে তার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। বিপথগামীদের যদি শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে সুবিচার হবে না। দুনিয়ায় যারা অন্যায় করবে দুনিয়ার আইনে তাদের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক অত্যাচারীর বিচার করা সম্ভব হয় না। আবার দুনিয়ায় এমন বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাও নেই যার দ্বারা একজনকে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যায়। জাহান্নামের আগুন এমন এক শাস্তি যা মানুষকে দগ্ধ করতে থাকবে কিন্তু তাতে মৃত্যু হবে না।

আখিরাতে আল্লাহ ইনসাফপূর্ণ বিচার করবেন। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ আমলনামা দেখানো হবে। কে কি করেছে তা না দেখিয়ে বিচার করা হবে না। প্রত্যেকের আমল যখন তার সামনে পেশ করা হবে তখন এমন বিস্তারিত ও পরিপূর্ণরূপে দেখানো হবে যে, বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ বা মন্দ কাজ বাদ দেয়া হবে না। যাদের ভালো কাজের পরিমাণ বেশী এবং খারাপ কাজের পরিমাণ কম আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। যদি প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ সব কাজের ভিত্তিতে বিচার করা হয় তাহলে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ এমন কোনো মানুষ নেই যার দোষ বা ভুল হয় না। অতএব ঐসব লোকই শাস্তি পাবে যাদের ভালো কাজের চেয়ে খারাপ কাজ বেশী। জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর যারা বিশ্বাসী তারাও এক সময়

www.amarboi.org

জান্নাতে যাবে। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের ভালো কাজ আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে সে কাজ হয়নি তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো পুরস্কার অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে জুটবে না। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করবে।

মানুষ যখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তার সকল কাজের বিচার করা হবে এবং এর থেকে কোনো রেহাই নেই তখন সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। মানুষের এ সচেতন প্রয়াসের ফলে সমাজ উপকৃত হয়। মানব সমাজে নেমে আসে শান্তি। আজকে সমাজের যে অবস্থা আমরা দেখি তাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত বিশ্বাসীর সংখ্যা আমাদের মাঝে অতি নগণ্য। অতএব, সমাজের কল্যাণের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য তথা পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস আনয়নের জন্য বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি প্রয়োজন। সমাজে বিশ্বাসীদের সংখ্যা যতবেশী হবে শান্তির সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পৃথিবীতে অবিশ্বাসীর সংখ্যা যতবেশী হবে শান্তির সম্ভাবনা ততই তিরোহিত হবে।

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও বুদ্ধিমত্তা

আমাদের চারদিকে যেসব দৃশ্য আমরা দেখি, যেসব ঘটনা অহরহ আমাদের সামনে ঘটে তার সবকিছুতেই রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য চিন্তার খোরাক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ مَّاۤءٍ فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِیْفِ الرِّیٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ○

"আসমান যমীনের সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে, মানুষের কল্যাণে সমুদ্রগামী জাহাজের মধ্যে, উষর মর্তের বুকে প্রাণ সঞ্চারণার্থে আকাশ হতে বর্ষিত বৃষ্টিতে, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে, বায়ুর ঘূর্ণনে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী আল্লাহর আজ্ঞাবহ মেঘের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন (সেইসব) মানুষের জন্য যারা (তাদের) বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে।"—সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৪

মানুষ তার বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, এ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছা। অতএব, বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আমাদেরকেও প্রয়োগ করতে হবে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক। সত্যকে উন্মোচনের জন্য মানুষের অর্ন্তজগতকে আলোড়িত ও আলোকিত করা অত্যাবশ্যক। সকল প্রকার কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত মন নিয়ে প্রতিটি বিষয়ে গভীর যুক্তিপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে না পারলে মানুষ অন্ধ অনুসরণ ও বন্ধ্যাত্বের শিকারে পরিণত হয়।

মানুষকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য প্রয়োজন। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান কোনো সময় মূল্যবোধ বিবর্জিত হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মূল্যবোধ বিবর্জিত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েছেন। একথা সত্য আধুনিক বিজ্ঞান সীমিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রম অগ্রসরমান। অসীম জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার একদিকে যেমন মানুষকে অধিক কার্যক্ষম করে তোলে

www.amarboi.org

তেমনি স্রষ্টার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়তর ও নতুনতর যুক্তিসমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু মূল্যবোধহীন বস্তুবাদীগণ বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার সাথে সাথে আত্মিক দারিদ্রতার কবলে আক্রান্ত হয়। শিল্পায়ন ও আর্থিক উন্নয়ন তাদের জন্য নিয়ে আসে নৈতিক অবক্ষয়। ফলে মানুষ পাপ, দুর্নীতি ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকে। ধর্ম ও বিশ্বাস সেখানে ক্রমেই তার প্রভাব হারাতে থাকে।

বল্গাহীন বস্তুবাদী মানুষের পক্ষে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব হয় না। ভোগবাদী মানসিকতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পরস্পর সংঘর্ষশীল। মানুষ যখন এর একটি বেছে নেয় তখন অপরটি সেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিশ্বাসীরা পার্থিব কামনা-বাসনার উর্ধে আল্লাহর উপাসনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। অন্য দিকে বস্তুবাদীরা প্রবৃত্তির দাস হয়ে নৈতিকতাহীন বল্গাহারা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাস্তুবাদীদের চিন্তাধারার সাথে বিশ্বাসীদের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বস্তুবাদীরা সৃষ্টিজগতকে মনে করে চিরন্তন। অর্থাৎ এর কোনো আদি বা অন্ত নেই। কিন্তু বিশ্বাসীদের বক্তব্য এর বিপরীত। বিশ্বাসীরা জানেন সৃষ্টিজগতের সবকিছুর যেমন সূচনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর সমাপ্তি।

সৃষ্টিকর্তা চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা। তাঁর সুচারু পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু চলছে এবং চলবে। মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা না থাকলে বস্তু নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। বস্তুবাদীরা তাই বলেন যে, বস্তু এক শাশ্বত সময় নিরপেক্ষ সত্তা যার আদি নেই, অন্ত নেই এবং বস্তু নিজেই আপনা আপনি আবির্ভূত। বিশ্বজগত সৃষ্টিকর্তা বিহীন এবং চিরন্তনরূপে বিরাজমান। বস্তুবাদীদের এ ধ্যান-ধারণা যেমন সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে তেমনি সৃষ্টি ধ্বংস ও পুনঃ সৃষ্টি তথা আখিরাতকে অস্বীকার করে। কিন্তু চরম সত্য এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে যে, বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্বশীল হয়েছে। অতএব, সৃষ্টির চিরন্তন নিয়মে একদিন ধ্বংস বা লয়প্রাপ্ত হবে। আজকের গ্রহ-নক্ষত্রসহ সকল বস্তুই সৃষ্টি হয়েছে চিরন্তন, সর্বজ্ঞ, সর্ব-ক্ষমতাবান সৃষ্টিকর্তার দ্বারা। তিনিই এ জগতকে সত্তাশীল করেছেন। বিশ্বাসীরা তাই বলেন যে, প্রকৃতিগতভাবে জীবনহীন কোনো সারসত্তা চিরন্তন হতে পারে না কিংবা জীবনের উৎসও হতে পারে না। বস্তুজগতের চিরন্তনতার কথা তারাই বলে যারা এ সৃষ্টিজগতের শাসনকর্তা ও পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। বার্তাবাহকদের (নবীদের) প্রত্যাখ্যান করে, ঐশীগ্রন্থকে প্রাচীন উপকথা বলে অভিহিত করে এবং আত্মতুষ্টিকর বিশ্বাস সৃষ্টি করে।

www.amarboi.org

বাস্তববাদীদের বিপক্ষে বিশ্বাসীদের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত। যেমন বলা হয়েছে, যখন আমরা আদি কারণ সম্পর্কে আলোচনা করি এবং দাবি করি যে, আল্লাহ্ কারণের প্রয়োজন হতে মুক্ত তখন আমরা একথা বলতে চাই না যে, সাধারণ সত্তাসমূহের মত তারও কারণের প্রয়োজন হতো কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি কার্যকারণের নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ কার্য নন যে তাঁর কখনো কোনো কারণের প্রয়োজন হবে। তিনি দৃশ্যমান কোনো সত্তা নন যে, তাঁর একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হবে। বরং তিনি সত্তার সমস্ত বহিঃপ্রকাশ ও প্রপঞ্চসমূহের উৎস, তিনি সকল সত্তার চিরন্তন উৎস স্বরূপ। তিনি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। যাঁর অস্তিত্ব তাঁর আপন সারবত্তা উদ্ভূত এবং যিনি কালের ঊর্ধে বিরাজিত। তাঁর কোনো কারণের প্রয়োজন নেই। দর্শনের ভাষায় কারণ অর্থ তাই যা কোনো কর্মকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করে এবং অস্তিত্বশীলতার রূপদান করে। এ সৃজনশীলতা বস্তুগত কারণের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুর পক্ষে যা সম্ভব তাহলো একরূপ থেকে অন্যরূপে অবস্থান্তর।

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মানুষকে বার বার সৃষ্টিজগতের সুশৃঙ্খল বিষয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

"তিনি সেই, যিনি ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং এর উপরে পর্বত-সমূহকে উত্তোলিত করেছেন। নদীকে তিনি করেছেন গতিশীল, আর তৈরী করেছেন ফল ও সম্ভার এবং সমস্ত কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আর উজ্জ্বল দিবসকে তিনি আচ্ছাদিত করেছেন তমসাঘন রাত্রির দ্বারা। নিশ্চয় এ সবকিছুর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে স্রষ্টার শক্তিমত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৩

আরো বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

"নিশ্চই আকাশজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

www.amarboi.org

বিচিত্র সৃষ্টিরাজির প্রতি লক্ষ করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, সবকিছু এক নিখুঁত, সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণভাবে বিরাজমান। লক্ষহীন অজ্ঞতার পথে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক মহান, জ্ঞানবান শক্তি, এক অসাধারণ সুশৃঙ্খল নীতিমালার উপস্থিতি। প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই আমরা লক্ষ করি সচেতন সতর্ক শক্তির নিয়ন্ত্রণ। যদি তা না হতো তবে সৃষ্টিরাজির রূপবৈচিত্র, অপূর্ব নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় থাকতো না। বুদ্ধিমত্তাহীন, অভিপ্রায়শূন্য কোনো শক্তির পক্ষে সুশৃঙ্খল বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই সৃষ্টির মহত্ব ও প্রকৃত রহস্য। আমরা যদি গভীর অন্তদৃষ্টি ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী হই তবে সহজেই একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে, এক অপরিসীম শক্তির কঠোর তত্ত্বাবধানে ও চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে বিশ্বজগতের সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সম্ভব।

একথা সত্য যে, সৃষ্টিকর্তাকে স্থান ও কালের সংকীর্ণ পরিসরে বাঁধা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো উপমা কিংবা মানুষের ভাষা তাঁকে যথার্থভাবে ও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারে না। আল্লাহকে প্রকৃতভাবে বুঝার ক্ষমতা আমাদের অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেই যদি আমরা বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে আগ্রহী হই তখন সৃষ্টিকর্তাকে নিছক কল্পনা মনে হবে না। চিন্তা শক্তির সাহায্যেই আমাদের পক্ষে এমন এক অস্তিত্বের কথা আবশ্যকভাবে উপলব্ধি করতে হয় যাঁর অবস্থান এ দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধে এবং তা চিরস্থায়ী। পরম সম্পূর্ণ সেই সত্তাই জগতের সকল অস্থায়ী, ভঙ্গুর ও অসম্পূর্ণ সত্তার কারণস্বরূপ বিরাজমান। এ পরম সত্তাই সর্বস্থান ও সর্বকালব্যাপ্ত হয়ে চিরবিরাজমান।

তিনি যদি বিদ্যমান না হতেন তবে সমস্ত জগত অবিদ্যমান হতো। আমরা সৃষ্টিজগতের প্রতি লক্ষ করলেই বুঝতে সক্ষম হই যে, বস্তু বা দৃশ্যমান সত্তার পেছনে রয়েছে এক আবশ্যক সত্তা। সমগ্র জগত অস্তিত্বশীল হবার জন্য এমন এক সত্তা অবশ্য প্রয়োজন যে সত্তা সার্বভৌম এবং যার উপর সকল অসীম ও আপেক্ষিক দৃশ্যমান বস্তু ও সত্তা নির্ভরশীল। এভাবে প্রতিটি বুদ্ধিমান ও আগ্রহী ব্যক্তিই স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বিশ্বজগতের সুসামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা লক্ষ করলে সহজেই বুঝতে পারি যে যিনি এর পরিকল্পনাকারী ও এর শৃঙ্খলা বিধানকারী তিনি অবশ্যই অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী। জীব জগতের বিভিন্ন প্রাণী কিংবা জড় জগতের অসংখ্য সৃষ্টিরাজির মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের পরিচয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত সর্বত্র। মহাশূন্যের নক্ষত্রের

www.amarboi.org

নীহারিকা, ছায়াপথ থেকে অণুপরমাণু পর্যন্ত সকল সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি অবহিত। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ

فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

"সমুদ্রের গভীরে বা পৃথিবী পৃষ্ঠে যাকিছু আছে তার সবই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। প্রতিটি পতনশীল পাতার কথা তিনি জানেন, মাটির বুকে সুপ্ত প্রতিটি বীজের কথা তিনি জানেন। সজীব ও শুষ্ক সবকিছুই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

যে কোনো সৃষ্টির প্রতি অবলোকন করলেই আমরা লক্ষ করবো যে, সব ক্ষেত্রে একটি সুচারু পরিকল্পনা কাজ করছে। অতএব একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সমগ্র জগৎ ও এর প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে উদ্দেশ্য। অহেতুক বা অমূলক কোনো কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। সমগ্র বিশ্ব চরাচর একটি উদ্দেশ্যময় সৃষ্টি। প্রতিটি জীব ও প্রতিটি বস্তু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মানুষ সব সৃষ্টি রহস্য এখনও জানতে পারেনি। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানই এর জন্য দায়ী। সকল সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট লক্ষ। সেই লক্ষের প্রতি সংগ্রাম ও প্রয়াসের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। মানুষ অন্য কোনো জীব বা জড়ের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। আমাদের জন্ম, মৃত্যু আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। জগতের সব সৃষ্টি ও লয় শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাধীন। শৃঙ্খলাবিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন বা কার্যকরণ নীতিবিহীন এ জগত নয়। সৃষ্টি হলো একটি সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যাপার।

জগতকে যখন আমরা সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি তখন অবশ্যই উপলব্ধি করি যে, এর প্রতিটি বস্তু ও জীবের সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে, প্রতিটি বস্তু ও জীব নিজ নিজ গুণে গুণান্বিত। জীবন প্রবাহকে সচল রাখার জন্য সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ ক্ষমতা। প্রতিটি ব্যক্তিই যেমন সমাজের কোনো না কোনো চাহিদা পূরণ করে এবং কোনো না কোনো সমস্যা সমাধানে অবদান রাখে, তেমনি প্রতিটি জড় সৃষ্টির রয়েছে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা, কাজ ও বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে রয়েছে সকল সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণকারী এক সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা। সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে সংযুক্ত করে রেখেছে এক অপরিহার্য ও সুগভীর শৃঙ্খলা ও নিয়ম যার বাইরে কোনো কিছু ঘটে না। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ـ

www.amarboi.org

"আল্লাহর নিয়মে তোমরা কোনো পরিবর্তন লক্ষ করবে না।"
–সূরা আল ফাতির ঃ ৪৩

বিশ্বাসীরা তাই বিশ্বজগতকে এক সচেতন অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ বলে বিশ্বাস করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা এ জগতের উপর ও এর প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর কর্তৃত্ব করে চলেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করে চলেছেন সমস্ত কার্যকলাপ। অতএব, একজন প্রকৃত বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ মানুষ বিশ্বজগত পরিচালনাকারী এ চেতনার সামনে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তার প্রশংসা করে থাকে। তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে, তাঁর রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশ্বাসীগণ অনুভব করেন যে, জীবন কেবলমাত্র ইহকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবার এ জীবনে যেমন ভোগ-লালসার জন্য নয় তেমনি এও নয় যে, কেবল দুঃখ, যন্ত্রণা পাবার জন্য ইহকালীন জীবন। বিশ্বাসীদের নিকট এ জীবন একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। পরবর্তী জীবনের সূচনায় মানুষের প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম নির্ভুল নিক্তিতে পরিমাপ করা হবে।

এ কালের অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে বিরাট আকারে পরিণত হবে এবং এরপর আবার চুপসে যাবে। যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط

"সেদিন আকাশজগতকে গুটিয়ে ফেলা হবে যেভাবে লিখিত কাগজ গুটানো হয়।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

সেদিন মহাবিশ্ব সংকোচিত হবে তখন সব সৃষ্টির বিলয় হবে। আমরা জানি বিশ্বজগতের সকল নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিসমূহ সর্বদা তাপ বিকিরণ করছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা তাপ বিকিরণ করতে করতে এক সময় এদের মৃত্যু ঘটবে। মহাবিশ্ব যে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অধুনা এটি একটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

"আমি (আল্লাহ) আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এটিকে সম্প্রসারণ করেছি।"–সূরা যারিয়াত ঃ ৪৭

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ? সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ মানুষের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান। চিন্তা ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যকে জানতে পারে। সত্যকে জানার

www.amarboi.org

সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে নিজেকে চেনা ও জানা। মানুষ যখন নিজেকে চিনতে ও বুঝতে পারে তখন সে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মানব দেহ ও এর জীবনী শক্তির রহস্য ও জটিলতা সম্পর্কে মানুষ যতোবেশী জ্ঞান অর্জন করতে পারে ততো সে বেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত ব্যাপক ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী।

মানুষের জীবন ও মৃত্যুর চিরন্তন নিয়মের পরিণতি কোথায়? কোন্ লক্ষে মানুষ পৃথিবীর পান্থশালায় বিচরণ করছে? ইহকাল ও পরকালের বিচারে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব মানুষকে অবশ্যই পেতে হবে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে, নিজের জীবনের লক্ষ সম্পর্কে এবং জীবনের পরিণতি সম্পর্কে সব ধরনের অস্পষ্টতা ও জটিলতা পরিহার করতে না পারলে মানুষকে জীবন সাগরে লক্ষহীন খড়কুটোর মতো ভেসে চলতে হয়। এ ধরনের লক্ষহীন ভেসে চলার মধ্যেই নির্বিকারত্ব ও উদাসীনতার জন্ম হয়। মানুষ তখন চরমভাবে গাফিলতির কবলে পড়ে যায় এবং বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, সকল মানুষকেই একদিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এজন্য ধার্মিকেরা বলেছেন, "যার নিকট মানুষকে ফিরে যেতে হবে, তার সাথে পূর্ব হতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করার মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণ নিহিত।" সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব যত বাড়বে তার সৌভাগ্যও সে পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ও বন্ধুত্ব স্থাপনের সর্বোত্তম ও সহজ পন্থা হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। মানুষ যতবেশী আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে ততবেশী তার মনে আল্লাহর স্মরণ প্রবল হতে থাকে। আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে নিমগ্ন রাখার জন্য মানুষকে অবশ্যই গুনাহ্ পরিহার করতে হবে। নিজেকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করার মধ্যেই মানব মুক্তির বীজ নিহিত। মানব-মুক্তির এই সোপান জানার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা কি হবে।

মৌলিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণের জন্য মানুষকে বিভিন্ন বৃত্তি, পেশা যা কোনো অবলম্বন। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য রাষ্ট্র ও প্রশাসনের রয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকা। যে কোনো জনপদের শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হন তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা। বৈষম্যহীন সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে ব্যক্তির ও সমাজের দায়িত্ব অর্পিত

www.amarboi.org

হয়েছে সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রকৃত মানুষরূপে যেন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য আবশ্যক। কিন্তু মানুষকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয় একটি চূড়ান্ত লক্ষকে সামনে রেখে। মানব জীবনের এ চূড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রয়োজন মানবতা ও মানবাত্মাকে সমুন্নত রাখা।

মানুষের জৈবিক চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণের পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা না থাকার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানুষ উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে থাকে। আজকাল মানব উন্নয়নের কথা জোরে জোরে বলা হলেও মানুষকে আত্মিক জীব হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কথা শুধু বিবেচনায় আনা হচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়নের নামে যন্ত্রায়ণের সহায়ক শক্তি হিসেবে মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে প্রকৃত মানব উন্নয়ন সম্ভব নয়। নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্ররূপ ভূমিকায় যখন অবতীর্ণ হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে থাকে।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের তাই একটি মধ্যপক্ষ অবলম্বনের জন্য বলা হয়েছে। মানুষ ইহকালে জীবিকার দ্বারা উপার্জন করবে কিন্তু তাকে অবশ্যই পরকালের মুক্তির জন্য নেকী অর্জন করতে হবে। বস্তুত পরকালের সম্বল সংগ্রহ করাই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পরকালের সম্বল সংগ্রহের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষকে পার্থিব সম্পদ উপার্জন করতে হবে। জীবিকা ও পেশার ক্ষেত্রে আমরা যদি পারলৌকিক সম্বল সংগ্রহকে নিজেদের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি তখন মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সক্ষম হয়ে থাকে। পরস্পরের অধিকার হরণের প্রচেষ্টা তখন অগ্রাধিকার পায় না। প্রতিটি মানুষ তখন প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি স্তরে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের মাধ্যমে প্রকৃত মানব উন্নয়নের দ্বারা পৃথিবীতে কাংখিত উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

জীবনের কন্টকময় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের মধ্যে বিবেকের সার্বক্ষণিক সচেতনতা, নিরবচ্ছিন্ন সাবধানতা ও অব্যাহত আল্লাহভীতিকে কুরআনের পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়েছে। জীবন পথের কাঁটা হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও কুৎসিত কামনা, বাসনা, অন্যায়, লোভ, লালসা,

www.amarboi.org

ঈর্ষা ইত্যাদি। একজন বিশ্বাসীর প্রধানতম কাজ হচ্ছে নিজেকে এসব কুপ্রবৃত্তি, কু-কামনা-বাসনা ও যাবতীয় অন্যায়, অনৈতিক কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা। যারা নিজেদেরকে সকল অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অনৈতিক কাজ হতে বিরত রাখতে পারেন তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং প্রকৃত তাকওয়া অর্জনকারী।

বস্তুত অদৃশ্যে বিশ্বাস মানুষের জন্য এমন এক অর্জন যা মানুষকে পশুত্বের স্তর হতে মনুষ্যত্বের স্তরে নিয়ে যায়। পাশবিকতার স্তর থেকে মানবিকতার স্বর্ণ তোরণে যাবার সিঁড়ি হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস। অদৃশ্যে বিশ্বাসের ফলেই মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, আমাদের দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের বাইরে একটি মহাসত্য রয়েছে। সেই মহাসত্য থেকে সৃষ্টিজগতের আবির্ভাব। এ মহাসত্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সত্তা ; যাকে আমরা দেখি না, কিন্তু তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন ও শুনেন। তিনি ন্যায়-অন্যায়ের সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি মানুষের সকল ন্যায়-অন্যায় বিচার করে গুনাহের শাস্তি ও নেকীর পুরস্কার দেবেন।

অদৃশ্যে বিশ্বাস মানুষকে বাস্তব বিমুখ হতে উৎসাহিত করে না বরং পার্থিব জীবনকে উন্নত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করাও মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মানুষকে পার্থিব সকল কাজ করতে হবে সেই মহান সত্তার দিকনির্দেশনা অনুসারে। মানুষ যদি নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে যাবতীয় অন্যায়, অনৈতিক ও গর্হিত কাজসমূহ করতে থাকে তবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। একজন বিশ্বাসী সৃষ্টিকর্তার মহান সত্তার প্রতি অবিচল আস্থাশীল থাকেন বলেই তিনি নিজেকে যাবতীয় অন্যায় ও অসত্য থেকে বিমুখ থাকার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। এ সচেতন প্রয়াসের নাম আল্লাহভীতি। যাদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহভীরুতা কাজ করে তাদের পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব হয় না, এবং এদেরকেই বলা হয়েছে মুত্তাকী বা পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জনকারী।

বিশ্বাসীদের একটি প্রধানতম গুণ হচ্ছে যে, তারা ইতিবাচক চিন্তা ও চেতনার ধারক। অবিশ্বাসীরা মানব জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, মানব জীবনের কোনো চরম লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই। পৃথিবীতে সাময়িক ভোগ বিলাসের পর মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু বিশ্বাসীগণ অদৃশ্যে বিশ্বাস করেন এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করেন। আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে সৎকর্মের প্রতি তার মনে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আখিরাতে বিশ্বাস তাকে জীবনের পরিণতি সম্পর্কে সদা সতর্ক করে

www.amarboi.org

এবং নীতি-নৈতিকতা সাহায্যপুষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার দ্বারা বিশ্বাসীগণ প্রতিনিয়ত নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করেন জীবনের ইতিবাচক পরিণতির কথা চিন্তা করে। পরকালে সৎকর্মের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা মানুষকে তাকওয়া অর্জনে সহায়তা করে এবং তাকওয়া অর্জনের দ্বারাই মানুষ সৎকর্মশীল হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় তাড়িত লোভ-লালসা থেকে মানুষ নিজেকে সুরক্ষা করে থাকে অদৃশ্যে বিশ্বাস থেকে উৎসারিত ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির সাহায্যে। অদৃশ্যে বিশ্বাস মানুষের চিন্তা জগতে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এর দ্বারা সে সমগ্র সৃষ্টিজগতের এবং নিজের সত্তার প্রকৃত লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়। মহাসৃষ্টি এবং অন্তরালে মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বময় কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সুচারু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা হয়। জীবন ও জগত সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের ফলে বিশ্বাসীদের কর্মজীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে থাকে। সীমিত সংকীর্ণ পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী অর্জনের প্রতি দৃকপাত না করে সে সত্য নির্ভর, নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

মহান সৃষ্টিকর্তা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস আল্লাহভীরুদের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য ইহকালকে পরকালের সাথে যুক্ত করে। ফলে বিশ্বাসীরা কর্ম ও কর্মফল তথা চরম পরিণতির কথা চিন্তা করেন। মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি বরং ত্যাগ তিতিক্ষার ও সৎকর্মের পুরস্কার এবং যাবতীয় অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে হবে এ চেতনা সৃষ্টির ফলে তার মন সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। বস্তুত তাকওয়া হচ্ছে বিশ্বাসীদের বিবেকের সচেতনতা। বিবেকের সচেতনতা দ্বারা সৎচিন্তা ও কর্মের উন্মেষ ঘটে। মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সংযোগ স্থাপিত হয়। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের আড়াল দূর হয়ে যায়। মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, সৃষ্টিজগত স্রষ্টার দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে শুধুমাত্র তার অসীম শক্তিমান ইচ্ছার প্রয়োগ দ্বারা। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রতিনিধি রূপে।

খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত মানুষ এ বিশ্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অতএব, মানুষকে পালন করতে হবে তার নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একজন বিশ্বাসীর জন্য শিষ্টাচার, নীতি-নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানবীয় এসব মূল্যবোধের উপর প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। একজন বিশ্বাসীর হৃদয়ে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্বাস ঘটে থাকে তাকওয়ার সাহায্যে। তাকওয়া মানুষের মনকে পবিত্রতা ও মহৎ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

www.amarboi.org

মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা নিজেদের চরিত্র গড়ে তোলা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এসব গুণাবলী অর্জন করতে প্রচুর চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। সত্য ও সুন্দরের পথে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য মানুষের প্রয়োজন আল্লাহর সাথে সুগভীর সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও হেদায়াত প্রার্থনা করা। কারণ আমাদের কর্মব্যস্ততা ও বৈষয়িক প্রয়োজনের নানা তাগিদে নীতি-নৈতিকতা থেকে আমরা প্রায়শই বিচ্যুত হয়ে পড়ি। নিজের জীবনে তার প্রতিফলনে অসমর্থ হয়ে পড়ি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্যায় ও অসত্যের আগ্রাসী শক্তি অনেক বেশী শক্তিধর ও ব্যাপক। এ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে নিজের আত্মিক মনোবলকে দৃঢ় করতে হবে। এ মনোবল দৃঢ় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জন। মানুষ যখন চির দুর্জয়, মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় তখন সে নিজের দুর্বলতা, সকল কামনা-বাসনা, সকল লোভ ও হাতছানি হতে মুক্ত হয়ে নিজেকে একজন মুত্তাকী বা প্রকৃত বিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের অনিবার্যতায় বিশ্বাস রাখা এবং সকল ব্যাপারে এ বিশ্বাস অবিচল থাকা তাকওয়া ও আল্লাহভীতির একমাত্র উৎস।

বস্তুত মানবজাতির মুক্তির উপায় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, জীবন পথে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসীগণ আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা-সাধনা করেন এবং আল্লাহর কাছে শাস্তিযোগ্য কার্যক্রম থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার চেষ্টা করেন। বিশ্বাসীদের এ সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টাকে তাদের এ কার্যক্রমকে ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়েছে। অতএব তাকওয়া একটি ব্যাপক কার্যক্রমের নাম। মুত্তাকী হওয়ার জন্য একজন মানুষকে ব্যাপক গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন।

তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রধানতম গুণ হচ্ছে বিশ্বাসী হওয়া। অদৃশ্যে বিশ্বাস তথা সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস এ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ফেরেশতা, ওহী, কিতাব, চূড়ান্ত বিচারের প্রতি পরম বিশ্বাসস্থাপন ছাড়া মুত্তাকী হওয়া সম্ভব নয়।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া যেমন জরুরী তেমনি জরুরী হচ্ছে এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা। প্রতিনিধিত্বের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে এ পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সৎ রুজি—আয় এবং সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা এমন

www.amarboi.org

একটি কাজ যা করতে বার বার কুরআনে তাগিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন ব্যতিরেকে মুত্তাকী হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলী ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করার সাথে সাথে আমাদের জবাবদিহির অনুভূতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা যায়।

❐

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও ইসলাম

"বিশ্বাসে আল্লাহ্‌ মিলে—তর্কে বহুদূর"। এ প্রবাদ জানার পরেও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক এক চিরন্তন বিষয়। মানব মনে যুক্তি-তর্কের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। ফলে যুক্তির আলোকে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার জন্য মানব-মন উন্মুখ থাকে। কোনো কিছুই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে মন চায় না। সৃষ্টিকর্তাকে যেহেতু দেখা যায় না সেহেতু তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করাকে অনেকেই মূর্খতা ভেবে থাকেন। এদের ধারণা, যারা অদৃশ্য শক্তির উপর বিশ্বাসস্থাপন করে তারা মূলত বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ আবেগ দ্বারা তাড়িত। বলা হয় যে, মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকে। কাল্পনিক অদৃশ্য শক্তির নিকট নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চায়। সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ মানুষ দুর্বলচিত্তের কারণে অদৃশ্য শক্তির নিকট নিজেকে সমর্পণ করে। যুগে যুগে মানুষের এ দুর্বলতার ফলেই যুক্তিহীনভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাসী হয়ে ওঠে মানুষ। মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার নিজেদেরকে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ বা আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেছেন।

আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে মানব মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। কারণ আল্লাহর প্রকৃত ধারণা আমাদের নিকট খুব স্পষ্ট নয়। সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ফলে মানবসমাজে যেমন অনেক বিশ্বাসী রয়েছে তেমন রয়েছে অনেক অবিশ্বাসী বা সংশয়ী। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস বা সংশয় মানব সমাজকে বিভক্ত করে দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের সাথে পরকালের প্রতি বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাঁরা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁরা পরকালের অনন্তজীবনকে বর্তমান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখে থাকেন। তাঁরা মনে করেন ইহকালের কর্মের প্রতিফল পরকালে পাওয়া যাবে।

সৃষ্টিকর্তা ও পরকালে বিশ্বাস এমন একটি মৌল বিষয় যাকে উপেক্ষা করা বা এ সম্পর্কে নির্বিকার থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী নির্ধারণে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে লক্ষ নির্ধারণে, অদৃশ্য শক্তির উপর বিশ্বাস অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রীতিনীতি, আইন-কানুন অভিন্ন হলেও একজন

www.amarboi.org

বিশ্বাসী ও একজন অবিশ্বাসীর কর্মধারা এক হতে পারে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের আচরণ এক হলেও লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন বিশ্বাসীর সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের পেছনে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জন মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু একজন অবিশ্বাসী, পারিপার্শ্বিকতা ও বৈষয়িক বিচার-বুদ্ধির আলোকে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে আগ্রহী হতে পারেন। এক্ষেত্রে বিশ্বাসীর জীবন ও কর্মধারা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষে ধাবিত এবং সে কারণে ভঙ্গুর নয়। একজন বিশ্বাসী জীবনকে সৎ ও সুন্দরভাবে যখন গড়ে তোলেন তখন তা বৈষয়িক স্বার্থ-বুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয় না। বরং পার্থিব স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পারলৌকিক শান্তির জন্য বিশ্বাসীরা লালায়িত।

ব্যক্তির জীবনাচরণ, সমাজ জীবনের চারিত্রিক কাঠামো গড়ে তোলে। অতএব সমাজের একজন সদস্য বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী তা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের উপাদান বা নিয়ামক হিসেবে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। দুর্বল বিশ্বাস, দুর্বল মানসিকতার জন্ম দেয়। ফলে সমাজ উপকৃত হয় না। বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করা অত্যন্ত জরুরী। আর এজন্য প্রয়োজন উন্মুক্ত মনে সকল জিজ্ঞাসার পটভূমি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। যুক্তি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে দুর্বল বিশ্বাসকে সবল বিশ্বাসে রূপান্তর করা সম্ভব নয়।

দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের কোনো প্রতিকার না দেখতে পেয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানব মনে প্রশ্ন জাগে এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি যে সৃষ্টিকর্তা সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী এবং একই সাথে সুবিচারক। যদি তাই হয় তবে যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা ও শোষণের ইতিহাস কেন সৃষ্টি হয়েছে ? কেন অত্যাচারী, শোষক, স্বৈরাচারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না ? অত্যাচারিতরা সবসময় প্রতিকার পায় না কেন ? আমাদের মনে এসব প্রশ্ন এসে দোলা দেয়। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা ক্রমাগত নির্বিকার ও উদাসীন। সমাজের বিরাট অংশ আজ শোষিত ও বঞ্চিত। কিন্তু শোষকের বিরুদ্ধে, অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের অক্ষমতা আমাদেরকে আল্লাহর গযবের প্রতি অভিলাষী করে তোলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা ভুলে যাই যে, সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র তখনই সামাজিক অন্যায় অবিচারের প্রতিকার তাঁর অদৃশ্য শক্তির দ্বারা করেন, যখন মানুষ নিজে প্রতিকারের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা নেয়। মানুষ যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে তোলে তাহলে আল্লাহর সাহায্য

www.amarboi.org

অবধারিত হয় না। আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানুষকে তাই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সত্যের পক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে এ বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হলে সফলতা অতি সহজ হয়ে পড়ে।

আমাদের মনে আরো একটি প্রশ্ন এসে দোলা দেয় যে, বর্তমানকালে যারা সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করেন কেন তাঁদের জীবন পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও অর্থ সম্ভারে পূর্ণ হয়ে ওঠে না ? দারিদ্রতার নির্মম শিকারে সৎ ব্যক্তিবর্গ কেন আজীবন কষ্ট পেতে থাকেন ? সৎ ও সুন্দরের প্রতি সহজাত প্রেম ও আকর্ষণ থেকেই এ প্রশ্নের উদ্রেক হয়। জীবন সম্পর্কে প্রচলিত ও সীমিত ধারণার ফলে এ প্রশ্নের সার্বিক জবাব আমরা খুঁজে পাই না। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ যে মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ নয় এ বিষয়টি আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়নি বলেই জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার মানদণ্ড আমরা নির্ধারিত করেছি বৈষয়িক সাফল্যের উপর। এ কারণে আমরা দেখি অনেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্থিব সুখ-সম্ভোগের কামনায় আকুল হয়ে ওঠেন। জীবনের সচ্ছলতা মানব জীবনে কাম্য, কিন্তু লক্ষ নয়। বিশ্বাসীদের একমাত্র কামনা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের লক্ষে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

জীবনকে সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সুস্থ সমাজ। অতএব বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। বিশ্বাসের সাথে কর্মের এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে ধর্ম। ধর্ম মানুষকে অলস জীবনযাপনে উৎসাহিত করে না। সামাজিক সুবিচার কায়েম করা সম্ভব হলে সৎ ও সুন্দর জীবনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ সামাজিক মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানলাভ করবেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব বিশ্বাসীরা ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কথা বলেন। কিন্তু চিন্তার অনগ্রসরতার কারণে আমাদের সমাজে ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবিদারগণ সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হননি। ফলে সামাজিক নেতৃত্ব চলে গেছে অবিশ্বাসী, দুর্বল বিশ্বাসী বা সংশয়ীদের করায়ত্তে। সমাজের এসব অবিশ্বাসী, দুর্বল বিশ্বাসী ও সংশয়ীদের নিকট যুক্তির আলোকে বিশ্বাসের স্বপক্ষে বিশ্লেষণমুখী ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন। ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে মহামানবগণ (নবী ও রাসূল) সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে আগাগোড়া মনগড়া কথা বলেছেন। শুধু তাই নয় বরং তাঁরা একশতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে, পরকাল নেহায়েত অনুমান নির্ভর বা কাল্পনিক। পরকালে কারো পুরস্কার, তিরস্কার বা

www.amarboi.org

শাস্তি পাবার কোনো সম্ভাবনা বা আশংকা নেই। অতএব ধরে নিতে হবে যে, তাঁদের মিথ্যা দাবির পেছনে পার্থিব কামনা-বাসনা একমাত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাস্তব ইতিহাস এ যুক্তি গ্রহণ করার মত সাক্ষ্য বহন করে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষরূপে যাঁরা নিজেদের দাবী করলেন তাঁরা পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করে সংকটময় ও নিদারুণ কষ্টদায়ক চলার পথকে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সুন্দর হবার ডাক দিয়েছেন। তাঁদের নিকট ঐশী বাণীর আগমন যদি কাল্পনিক ও মিথ্যা হতো তবে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বৈষয়িক স্বার্থ-বুদ্ধির দ্বারা এমন বক্তব্য পেশ করতেন যাতে করে সম্পদ, বৈভব, ক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত হয়। পরকালের পুরস্কারের মিথ্যা আশ্বাস দ্বারা তাঁরা নিজেরা নিজেদের প্রতারিত করতে চাইতেন না। তাঁরা দুঃখ, যন্ত্রণা ও সংঘাতময় কঠিন জীবন বেছে নিতেন না।

এছাড়া কোনো রাসূল বা নবী পূর্ববর্তীদের আগমনকে অসত্য বলেননি। আরো লক্ষণীয় যে, সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল সম্পর্কে সকল নবী ও রাসূল একই ধারণা পোষণ করেছেন। মানুষের প্রতি সবার আহ্বান ছিল সৎ, সুন্দর ও নির্মল জীবনের। সর্বোপরি সকল নবী ও রাসূলের জীবন ছিল সর্বোত্তম আদর্শের উজ্জ্বল নমুনা। তাঁদের সততা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা নিয়ে কখনো কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। ফলে যুক্তিবাদী মানুষ তাঁদের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছে কোনোরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে। বস্তুত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং পরকালের অস্তিত্বের প্রতি অবিচল আস্থা থাকলেই মানুষ নিজের জীবনকে সর্বতো সুন্দর ও মহৎ করে তুলতে পারে। পার্থিব কোনো আদর্শ মানুষকে "সর্বোত্তম" হবার প্রেরণা দিতে পারে না। জীবনকে তুচ্ছ করে নিজেকে উৎসর্গ করার বৈপ্লবিক শক্তি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ফলে। অতএব মানব জীবনকে তথা বিশ্বসমাজকে সৎ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার ঐকান্তিক তাকিদেই বিশ্বাসীদের প্রয়োজন।

আমাদের সমাজের একজন প্রকৃত বিশ্বাসী বা ধার্মিককে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, "ধর্ম বা বিশ্বাস আপনাকে কি দিয়েছে ?" সম্ভবত তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল-এর মতো জবাব দেবেন, "অন্যরা যে কাজ করে আইনের ভয়ে বা লোক ভয়ে, সে কাজটিই আমি করি স্বতস্ফূর্তভাবে, স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে। বিশ্বাস ও ধর্ম (জীবনদর্শন) আমাকে সে শক্তি ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে।" বস্তুত প্রকৃত যিনি ধার্মিক তিনি নিজেকে পরিচালিত করেন বিবেকের তাকিদে। জীবনের সকল প্রকার বাধা-বিপত্তির মুখে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণমুখিতার মহান আদর্শ হতে প্রকৃত ধার্মিক কখনো বিচ্যুত হন না। সকল প্রকার নিপীড়ন, অত্যাচার সহ্য করেও প্রজ্ঞা ও বিবেকের দাবিকে

৩—

www.amarboi.org

সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাঁরা নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত তারাই বিশ্বাসী এবং ধার্মিক।

ইসলাম ধর্মকে একটি জীবন দর্শন হিসেবে যারা গ্রহণ করেন তারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার মধ্যেই নিজেদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন না বরং জীবনের নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল দিকের সুষ্ঠু সমাধান বাতলে দেন ধর্মীয় নীতি ও দর্শনের আলোকে। ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাস্তব জীবনের সাথে নীতি-নৈতিকতার এ সুনিবীড় সম্পর্কের জন্য ইসলাম ধর্মকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। বস্তুত বাস্তব জীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক না থাকলে মানবজীবনে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিছু কিছু অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মানুষের আবেগ নির্ভর হয়ে পৃথিবীতে টিকে রয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা জীবনদর্শন হিসেবে একমাত্র ইসলাম ধর্মকেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা জীবন দর্শনের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? এ প্রশ্নের সহজ ও সরল জবাব —"হাঁ, শুধুমাত্র মানুষের জন্যই জীবনদর্শন বা জীবনবিধান অপরিহার্য।" কারণ মানব জীবন লক্ষহীনভাবে এগিয়ে যেতে বা জীবন-সমুদ্রে মানুষ শুধুই ভেসে বেড়াতে পারে না। জীবনযাপনের ঐকান্তিক তাকিদে মানুষ কতিপয় মূল্যবোধকে ও মূল্যমানকে লালন করে থাকে। মানবীয় সত্তা ও স্বকীয়তা এসব মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের প্রয়োজন তখনই থাকবে না যখন মানুষ তার মানবীয় স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে চাইবে। মানুষ যদি তার শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে পাশবিক স্তরে নেমে যেতে চায়, সত্য, সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপনের পরিবর্তে নীতি-নৈতিকতাহীন উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়ে পড়ে, তখনই শুধুমাত্র মানব জীবনে মূল্যবোধ ভিত্তিক জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য জীবনযাপন করে না। সত্যকে জানার জন্য তার রয়েছে অদম্য আগ্রহ। সমগ্র সৃষ্টিজগত এবং মানব-জীবনের পরিণতি সম্পর্কে মানুষ জানতে চায়। বিশ্বজগতের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও কাঠামো সম্পর্কে যুক্তিহীন কোনো ব্যাখ্যা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রায়োগিক পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে না। ফলে মানুষ যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্য ও সুন্দরকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। মানব মনের সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার জন্য তাই প্রয়োজন

www.amarboi.org

হয়েছে একটি জীবনদর্শনের। কেননা বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা (Metaphysics) জীবন সম্পর্কে যে খণ্ডিত ও আংশিক ধারণা দিয়ে থাকে তাকে পূর্ণতা দিয়েছে ধর্মীয় জীবনদর্শন। এ কারণেই মানব-জীবনের মানব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানবসত্তা থেকে অতি-প্রাকৃতিক চিন্তা-চেতনাকে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয় বলেই সত্যানুসন্ধানী মানুষকে ধর্মীয় জীবন দর্শনের সাহায্যে সত্যকে জানতে হয়। জীবন ও জগত সম্পর্কে মৌলিক যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় সেসব প্রশ্নের জবাব মানুষ পেতে চেয়েছে নিজের জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে। ধর্মীয় জীবন-দর্শন তাই অন্ধ সংস্কার নয় বরং সত্য আবিষ্কারের আকুলতা এবং সুন্দর জীবনযাপনের নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত। তবু প্রশ্ন ওঠে যে, বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতির সাথে সাথে জীবন-দর্শনের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যায়নি ? মানুষ চিরকাল সত্যকে জানতে চেয়েছে। তাই সে "বিশ্বাস"কে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। মানুষের বিশ্বাস যেহেতু বিমূর্ত ও অদৃশ্য শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেহেতু সত্তার (Intuition) ভিত্তিতে মানুষকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। বস্তুত সত্তা-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীদের চিন্তা ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

একথা সত্য যে, বর্তমানকালে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এবং মানুষের চিন্তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু মানবীয় সুকুমারবৃত্তিকে লালন করার জন্য বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার বা প্রযুক্তি কাজে লাগে না। জীবনকে সুন্দর করার জন্য নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবীয় সুকুমারবৃত্তির পরিচর্যা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় জীবনদর্শন এ লক্ষ অর্জনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। অতএব সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে আহ্বানের জন্যই ধর্মের অনিবার্যতা সম্পর্কে মানব মনে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। "রিলিজিয়ন" শব্দের উৎপত্তি "রিজিও" থেকে, যার অর্থ সংযোগ করা। মানব জীবনকে সত্য ও কল্যাণের সাথে যা সংযোগ করে তাই 'রিলিজিয়ন' বা ধর্ম। ধর্ম মানুষকে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস করতে শেখায়। মানুষের জীবনের লক্ষ, জীবন দর্শন, আচার -আচরণ প্রভৃতি নির্ভর করে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর।

প্রত্যাদেশ বা ওহীর প্রতি বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রধান শর্ত। এজন্য ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে বুঝে থাকি। সৃষ্টিকর্তা নিজেকে অভিব্যক্ত করেন প্রত্যাদেশ (ওহী)-এর মাধ্যমে। নবী স.-এর মাধ্যমে ধর্মীয় নির্দেশাবলী প্রেরিত হয়েছে মানুষের মুক্তির পথনির্দেশিকা হিসেবে। ধর্মের

www.amarboi.org

প্রকৃত লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। মানুষের জন্য ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ধর্মের ছদ্মাবরণে মানুষের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও অন্ধকার ছেয়ে আছে তা ধর্ম নয়। মানব কল্যাণের বিপরীত কোনো ধ্যান-ধারণা ও আচার, অনুষ্ঠানকে ধার্মিকতা বলা যায় না। ধর্ম প্রচারকগণ তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছেন মানব কল্যাণের লক্ষে। মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছেন সঠিক পথনির্দেশনা। ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের লক্ষ্যে যে বাণী নবীগণ প্রচার করেছেন তার সার্বিক অনুসরণের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী নিজেকে ধার্মিক হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

আদিম যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকালে এমন কোনো মানব সমাজের খবর পাওয়া দুষ্কর যেখানে ধর্ম ও বিশ্বাসের উপস্থিতি নেই। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম। যারা সরাসরি আল্লাহকে অবিশ্বাস করে বা নাস্তিক হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দেয় তারাও স্বীকার করে যে, জগত ও জীবনের উৎসমূলে কোনো শক্তি কাজ করছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের বলে যে শক্তিকে আল্লাহ বলা হয় দার্শনিকদের অনেকে তাকে পরমসত্তা বলে অভিহিত করে থাকেন।

বর্তমান শতকে ধর্মের বিকল্প হিসেবে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" কে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ ধর্ম বিশেষ করে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। এদের মতে ব্যক্তিগত সম্পদ সব অনর্থের মূল। কিন্তু ধর্ম ব্যক্তিগত সম্পদ অনুমোদন করে থাকে। খৃস্টধর্ম অনুসারে মানুষ যখন যে অবস্থায় থাকে তা আল্লাহর ইচ্ছায় থাকে। সমাজতন্ত্রের দীক্ষাগুরু কালমার্কস ধর্মীয় এ ধ্যান-ধারণাকে কুসংস্কার হিসেবে বিবেচিত করলেন এবং সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কায়েম করতে বললেন। ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মহৎ কামনায় অনেকেই "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের" প্রতি আকৃষ্ট হলো। ধর্মের বিরুদ্ধে শুরু হলো এক দুর্বার অভিযান। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের করুণ পরিণতি প্রমাণ করেছে যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে এক অসার ও অবাস্তব জীবনদর্শন। সেই সাথে এ সত্যও প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ম কখনো অকেজো ছিল না এবং আজো তা নয়।

সমাজের ধনিক শ্রেণী কর্তৃক গরীব মানুষের প্রতি অবিচার, যুলুম, শোষণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রকৃত ধর্ম কখনো শোষণ ও বঞ্চনার সমর্থন করে না। সামাজিক অনাচার ও অবক্ষয়ের জন্যও ধর্ম দায়ী নয়, বরং এর জন্য দায়ী কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা ধর্মের নামে অধর্মকে প্রতিষ্ঠা

www.amarboi.org

করতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় শোষণের পথকে উন্মুক্ত রাখার জন্য। এসবই করা হয় ধর্মের অপব্যাখ্যার সাহায্যে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম চিন্তানায়কগণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক "সমাজতন্ত্রের" ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন। মুসলিম মনীষিগণ বরং যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলাম ধর্মের ইনসাফভিত্তিক সুষ্ঠু ধন বন্টন ব্যবস্থা চালুর দাবি করেছেন। কেননা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে মানুষকে রাষ্ট্রের মজুরে পরিনত করা হয় এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আজকের সামাজিক সমস্যা মূলত অর্থনৈতিক নয় বরং নৈতিক। অতএব মানুষের নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ ও পুনর্গঠনের দ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

ধর্ম মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে শেখায়। কোন্ বিষয়ে মানুষের কল্যাণ এবং কিসে মানুষের অকল্যাণ, কোন্ কাজ মানুষের করা উচিত এবং কোন্ কাজ করা উচিত নয় তা আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ মানুষের আনুগত্য কামনা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য। কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত) মানুষ নিজের খেয়াল খুশীমত লক্ষহীনভাবে দুনিয়ায় বিচরণ করুক, পশুর মত আচরণ করুক এটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা নয়। এজন্যে তিনি মনোনীত নবীর মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করে বলেছেন যেন মানুষ আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তার আনুগত্য করে এবং মহানবীর মারফত মানুষের নিকট যে জ্ঞানের আলো এসেছে তা গ্রহণ করে। তাহলে মানুষ সহজ-সরল পথের সন্ধান পাবে এবং এই সোজা পথে চলেই মানুষ ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَـٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

"হে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে। আমিই তোমাদের কাছে উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি। অতপর যারা ঈমান আনলো, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং এ ধরনের লোকদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৪-১৭৫

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

"হে আদম সন্তান! আমার নবী যখন তোমাদের নিকট বিধান নিয়ে আসবে, তখন যারা সেই বিধানকে মেনে আদর্শ জীবনযাপন করবে এবং সেই অনুসারে নিজেদের সকল কর্মকাণ্ড সমাপন করবে তাদের কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৫

আল্লাহ্ মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে বলছেন যে, তিনি নবীর সাহায্যে জ্ঞানের আলো প্রেরণ করেছেন। অতএব নবীর প্রতি মানুষকে বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে। মানুষকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর নিকট থেকে রাসূল স. যে বিধান ও উপদেশ নিয়ে এসেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যদি কোনো বিধি-বিধানের উপকারিতা বা কার্যকারিতা হৃদয়ংগম করতে ব্যর্থ হয় তবু আল্লাহর বিধান সত্য এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবনের প্রতি কাজে সেই বিধান অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বাসস্থাপন করার পরে মানুষ যদি তার কার্যাবলী বিশ্বাসীর অনুরূপ না করে তাহলে মানুষের পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত আলো থেকে কোনো উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না।

ইসলাম ধর্ম প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের মধ্যে সর্বশেষ ধর্ম এবং কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ। আরবী ভাষায় ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য স্বীকার করা। সিলম ও সালাম অর্থ শান্তি। ইসলামের পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি লাভ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف

"আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন (ধর্ম) হচ্ছে শুধু ইসলাম।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

দীনের শাব্দিক অর্থ আনুগত্যের বিধান। "দীন-ইসলাম" অর্থ আল্লাহর নিকট থেকে রাসূলের নিকট প্রেরিত ইসলাম নামক জীবনবিধান। ইসলামকে বলা হয়েছে শান্তির ধর্ম। কেননা আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের পথ এ ধর্মে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী "ইসলাম" নবী মুহাম্মদ স. কর্তৃক প্রচারিত নতুন কোনো ধর্ম নয়। মানুষ পৃথিবীতে

www.amarboi.org

যেদিন প্রথম আগমন করেছে সেদিন থেকেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের "জীবন বিধান" আল্লাহ্ মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন। কারণ মানুষের জন্য "আল-ইসলাম" হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল ও অনুসরণীয় জীবনব্যবস্থা। যুগে যুগে যত নবী এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের আহ্বান ছিল "আল-ইসলাম" বা আনুগত্যের জীবনবিধান মেনে চলা। নবী মুহাম্মদ স. একই আহ্বান জানিয়েছেন। এই অর্থে ইসলাম নতুন কোনো ধর্ম নয় বরং আল্লাহ্ প্রেরিত একমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। একমাত্র জীবনব্যবস্থার অর্থ ইসলাম এমন এক চিরন্তন ও মৌলিক বিধান যা মানুষকে জীবনের চলার পথে প্রতিনিয়ত দিকনির্দেশ দিয়ে থাকে।

কিন্তু মানব মনে প্রশ্ন ওঠে যে মানুষের জন্য একমাত্র আল্লাহর দিকনির্দেশনা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? চিন্তাশীল মানুষ উপলব্ধি করেছেন যে মানব জীবনধারা ও সামগ্রিকভাবে মানবজাতি একটি অবিভাজ্য সত্তা। সব মানুষের দেহে এক রক্ত প্রবাহিত। অতএব মানব জীবনের লক্ষ এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের চলার পথে একটি মহৎ লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানব-চরিত্র বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব মানুষের জন্য প্রয়োজন এমন একটি পথনির্দেশনা যা মানুষের সামগ্রিক জীবনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। যে পথ অনুসরণ করে বিশ্ব-মানবতা মহত্তম লক্ষে পৌঁছতে পারবে। বিশ্ব-মানবতার কৃত্রিম বিভাজন মানব-কল্যাণের সহায়ক নয়। দুনিয়ার সকল মানুষকে সব যুগে সকল অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষে আল্লাহ মানুষকে যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন তাই হচ্ছে ইসলামী জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থায় রয়েছে সুস্পষ্ট কর্মনীতি ও নির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ যা অনুসরণ করে মানুষ ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক কার্যক্রম নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর সকল সৃষ্টির জন্য যেমন নির্ধারিত পথ ও সীমারেখা নির্দেশ করেছেন মানুষের জন্যও তিনি দিয়েছেন নির্ভুল ও কল্যাণকর পথনির্দেশনা। অতএব, মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর নির্দেশিত কল্যাণকর পথে চলা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

মানব-জীবনের দিকনির্দেশনা ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে আল কুরআন। অতএব যে কোনো জ্ঞান-পিপাসু মানুষের উচিত কুরআনকে অনুধাবন ও অনুসরণ করা। কালের ইতিহাসে পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ মানব জীবন ও সমাজের উপর এতো ব্যাপক ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কুরআন মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলভিত্তি। প্রত্যয়শীল মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মৌল নীতিমালা এবং মানব-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ, নীতি-

www.amarboi.org

নৈতিকতা পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে জ্ঞান-গবেষণার ভিত্তিমূল নিহিত রয়েছে।

কুরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় বরং মহান আল্লাহর বাণী। মুসলমানরা এ গ্রন্থকে সংরক্ষণ করেছেন অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ কুরআন অপরিবর্তিত ও অবিকৃত আবস্থায় বিরাজ করছে। আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা হুবহু তাই আছে যা তার বাহক নবী মুহাম্মদ স. দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন। অতএব দিকনির্দেশনা ও চিন্তা-গবেষণার জন্য মানুষকে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। হযরত মুহাম্মদ স. কুরআনকে তুলনা করেছেন চন্দ্র-সূর্যের সাথে। কুরআন চন্দ্র-সূর্যের মতো চির আলোকময় ও চিরগতিশীল। পবিত্র কুরআন শুধু মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার খোরাক নয় সেই সাথে হৃদয় এবং আত্মারও খোরাক। কুরআন একদিকে যেমন যুক্তির ভাষায় মানুষের বুদ্ধির নিকট আবেদন করে তেমনি এর আবেদন মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়। মানব-হৃদয়কে ঔজ্জ্বল্য দান করতে এবং পবিত্র ও উদ্দীপ্ত করতে চায় কুরআন। মানুষের নৈতিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা এ গ্রন্থের কাজ। এ গ্রন্থ পাঠ করলে বিশ্বাসীর হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে ওঠে এবং প্রেমানুভূতির সৃষ্টি হয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্লানিতে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং হৃদয়কে প্রকম্পিত করে। মানুষ আলোকিত হয়। তার জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়। সূর্য যেমন চন্দ্রকে আলোকিত করে, কুরআন একইভাবে মানুষকে আলোকিত করে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

"এই গ্রন্থ যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১

মানব জীবনের সকল অন্ধকার তথা অজ্ঞানতা, অনৈতিকতা, অন্যায়-অবিচার ইত্যাদি দূর করার জন্য কুরআনের আবির্ভাব হয়েছে। বস্তুত কুরআনের লক্ষ হচ্ছে যাবতীয় অনৈতিকতা ও সামাজিক দুর্নীতিকে ধ্বংস করে মানুষকে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পথে তথা আলোর দিকে পরিচালিত করা। পবিত্র কুরআন মানুষকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায় যাতে করে সে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অন্তরের শক্তি থেকে উপকৃত হতে পারে। কুরআন মানুষকে সত্য পথে পরিচালিত করতে চায় কারণ পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা কুরআনের উদ্দেশ্য। অতএব বিশ্বাসীরা কুরআন অধ্যয়ন করেন সত্যের প্রতি

www.amarboi.org

ভালোবাসা ও ন্যায় নিষ্ঠার কারণে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করার জন্য কুরআনে তাকিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

"যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে কাজ করে না আল্লাহ্ তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০০

আরো বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা বোবা-বধির এবং চিন্তা-ভাবনা করে না।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২২

অতএব বিশ্বাসী হতে হলে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিহার করতে হবে কুরআন এ ধারণাকে সমর্থন করে না। বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত সেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ভালো-মন্দ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি মাপকাঠি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ

"সেই সফলতা লাভ করেছে যে নিজেকে সংশোধন করেছে।"
–সূরা আশ শামস ঃ ৯

বস্তুত মানুষ যখন নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারে এবং তাকওয়ার মাধ্যমে পথ চলতে সক্ষম হয় তখনই সে সফলতার পথে এগিয়ে যায় এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ○

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি গ্রহণ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য অন্তর্দৃষ্টির আলো দান করবেন।"
–সূরা আল-আনফাল ঃ ২৯

কুরআনে এভাবে উন্নত-চরিত্র গঠনের জন্য আত্মিক পরিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষকে তাই অন্ধকার পরিহার করে আলোর পথে এবং অকল্যাণ পরিহার করে কল্যাণকে বেছে নিতে হবে।

ব্যক্তির হৃদয়-মনকে পূত-পবিত্র রাখতে হলে সমাজ ও পরিবেশকেও কলুষমুক্ত রাখা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে তাই সমাজ ও পরিবেশকে সুন্দর ও

www.amarboi.org

সুস্থ রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص

"পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করো আর পাপ ও সীমা-লংঘনমূলক কাজে কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করো না।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ২

সূরা আল বাকারার ১৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

"এ কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্য ও কল্যাণমূলক জীবন বিধান। এতে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিধি ব্যবস্থা এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী অকাট্য দলীল প্রমাণ।"

কুরআনের এ দাবীর অর্থ ইসলাম শুধু ধর্ম নয় বরং বিশ্বের মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পৃথিবীর কোনো ধর্ম এ দাবি করেনি। তাই কুরআনের এ দাবি যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মানুষের হৃদয় মনে কুরআনের বক্তব্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মন-মানসিকতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়।

কুরআন ও ইসলাম ধর্মের এ ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা মানব জীবনের মৌল লক্ষসমূহকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হতে পারি। জীবনের লক্ষ্যসমূহকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করতে পারলেই মানুষ পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান ধর্মানুরাগীরূপে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়। একজন আদর্শ মানুষ, বিশ্বাসী ও ধার্মিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য জীবনের লক্ষ-সমূহকে নির্বাচন ও নির্ধারণ করতে পারে যেমন ঃ

ক. আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ,

খ. চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের সমন্বয় সাধন,

গ. মনের বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূরীকরণ,

ঘ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন,

ঙ. মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ,

চ. নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন,

ছ. স্বৈরাচার ও অন্যায় অবিচারের মূলোৎপাটন,

জ. ভ্রান্ত সামাজিক প্রথার বিলোপ সাধন,

www.amarboi.org

ঝ. সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ,

ঞ. দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও সমাজ সংগঠন,

ট. স্বাধীন-ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রচলন,

ঠ. ন্যায়ভিত্তিক ধনবণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ,

ড. সহযোগিতা ও সহমর্মিতামূলক কল্যাণমুখী ব্যবস্থাদির প্রচলন ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত মৌল লক্ষসমূহ অর্জনের জন্য ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। যে কোনো চিন্তাশীল মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হবেন যে, ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে দিকনির্দেশনা ও বিধি-ব্যবস্থা দান করেছে। ইসলাম ধর্মের এ পূর্ণাঙ্গ রূপ অবলোকন করেই সম্ভবত এ কালের দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন ঃ "ধর্মের যুগ অতিক্রান্ত। আমার বিশ্বাস দুনিয়ার প্রায় সবকটি ধর্মই নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের চিরঞ্জীব ও শাশ্বত হয়ে থাকার বিশেষত্ব ও যোগ্যতা বর্তমান। কেননা তা সব দিক দিয়ে উন্নত। সমাজ ও সময়ের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। ইসলাম শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই গুরুত্ব আরোপ করে না, সমস্ত জৈবিক ও বৈষয়িক ব্যাপারেও তা মানুষকে পথপ্রদর্শন করে।" ইসলামকে তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন বলা হয়েছে। বিজ্ঞান, দর্শন, বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ও প্রজ্ঞা কোনো কিছু দিয়েই ইসলামের এ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত জ্ঞান-গবেষণার যত বিকাশ ঘটছে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্ব ততোবেশী প্রতিভাত হচ্ছে এবং হবে। মানব কল্যাণের জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ততবেশী অনুভূত হবে। পবিত্র কুরআনে তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

"আজ তোমাদের জন্য আমার দেয়া জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার দেয়া এ নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং এ দীন ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।"

—সূরা আল মায়েদা ঃ ৩

আল্লাহর মনোনীত জীবনবিধানকে পরিপূর্ণভাবে জানার, বুঝার এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনের লক্ষ ঠিক করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে মানুষকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে "দীন-ইসলাম"।

www.amarboi.org

জীবনদর্শন ও ইসলাম

কোনো বিষয়কে যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা দর্শনশাস্ত্রের কাজ। পূর্ব সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুক্তবুদ্ধির আলোকে সত্য অনুসন্ধান করা দর্শনের বিষয়। বস্তুত দার্শনিকগণ আবেগের চেয়ে বিবেকের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। যুক্তি ও বিবেকের সমন্বিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে যুগে যুগে চিন্তাশীল দার্শনিকগণ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। মানুষের মনের ও মানব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রয়োজনে রচিত হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব। এভাবে জীবনের সাথে দর্শনের একটি সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীবনের সাথে দর্শনের এ সম্পর্কের ফলে দর্শনের মৌল লক্ষ ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও মহৎ জীবন ; এদিক থেকে বিচার করলে ধর্ম ও দর্শনের লক্ষ এক ও অভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু দার্শনিকরা সবাই বিশ্বাসী নন। একজন বিশ্বাসী দার্শনিক দর্শনের সাহায্যে তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করেন। ধর্মের মৌল নীতিমালার প্রতি আস্থাশীল থেকে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে তিনি অনুসন্ধান করেন জীবনের বহুবিধ সমস্যার যৌক্তিক সমাধান। তাই যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী ও দার্শনিকগণ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে মানব জীবনে ধর্মীয় চেতনার ভূমিকা ও উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন। এর বিপরীতে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাসী দার্শনিকদের জগত ও জীবন সংক্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস আল্লাহর অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করেছেন তেমনি পুণ্যে পুরস্কৃত হবে এবং পাপের শাস্তি পেতে হবে এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মার্কসবাদীদের মতে নীতি-নৈতিকতা সবসময় শাসকগোষ্ঠী ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ধারণা নৈতিক অনুশাসনের কথা বলা হয় মেহনতী মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার জন্য। মার্কসবাদী চিন্তানায়কগণ কখনো স্বীকার করেন না যে, মালিক ও শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন মানুষ। সম্ভবত এ কারণেই নৈতিক গুণাবলীকে এরা অস্বীকার করেছেন। মানবীয় নৈতিক গুণাবলী নয় বরং শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ গঠন সম্ভব বলে তাদের ধারণা। কিন্তু মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার করুণ পরিণতি ও অসারত্ব প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে। বিশ্বাসহীন

www.amarboi.org

জীবনদর্শনের বাস্তব পরিণতি সমগ্র মানব সমাজের জন্য বিশেষ করে বিশ্বাসীদের জন্য চিন্তার ও কর্মের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ; বিশ্বাস ভিত্তিক জীবনদর্শন মানব কল্যাণের লক্ষে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা কখনো সরল বিশ্বাসে, কখনো বা যৌক্তিকতার আলোকে বিশ্বাস ভিত্তিক জীবনাচরণ মানব সমাজে উপহার দিয়েছেন। বিশ্বাসী দার্শনিকগণ উপস্থাপন করেছেন বিশ্বাসভিত্তিক জীবন-দর্শন। দার্শনিক আল ফারাবীর (৮৭০-৯৫০) দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল কারণ আল্লাহ্। তিনি বলেন, কারণ ছাড়া কোনো কাজ সংঘটিত হয় না। অতএব, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই একটি কারণ আছে, আর সেই কারণ হলেন আল্লাহ্। দার্শনিক আল-ফারাবীর “কারণিক” যুক্তির পাশাপাশি পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ উপস্থাপন করেছেন “উদ্দেশ্য বাদী” যুক্তি। সৃষ্টিজগতের বিশিষ্টতা লক্ষ করেই এ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিতে যে শৃংখলা ও পরিকল্পনার নিদর্শন লক্ষ করা যায় মানুষ তা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং এর থেকেই একজন পরিকল্পনাকারী বা স্থপতির অস্তিত্বের প্রতীতি জন্ম লাভ করেছে। নির্মাতা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না ; অতএব বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। উদ্দেশ্যবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, সৃষ্টিজগতের অবশ্যই একটি লক্ষ আছে এবং যেহেতু লক্ষ আছে অবশ্যই এর পেছনে রয়েছে একটি পরিকল্পনা। সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন আল্লাহ্। পরিকল্পনাকারী আল্লাহ্ একটি চেতন-সত্তা। কারণ সৃষ্টিজগতের সবকিছু একটি নিয়ন্ত্রিত নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এবং নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সচেতন সত্তার পক্ষেই সম্ভব।

বিশ্বাসী দার্শনিকগণ সৃষ্টিজগতে লক্ষ করেছেন নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃংখলা। প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতার অনুরূপ মানব প্রকৃতিতে রয়েছে নৈতিক গুণাবলী। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর মতে নৈতিক মূল্যবোধের ফলে সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্যতিরেকে পুণ্য ও পাপের অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবীতে পাপীদের শাস্তি সবসময় হয় না। কিন্তু মানবীয় নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী সৎকাজের পুরস্কার অবশ্যই থাকতে হবে। অতএব পাপীদের শাস্তি ও পুণ্যবানের পুরস্কার আল্লাহ্ পরকালে প্রদান করবেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন এমন এক অনন্ত সত্তা যিনি শুধু বিশ্বজগতের স্রষ্টা নন সেই সাথে নৈতিক জগতের শাসক। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর দার্শনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে নৈতিক চেতনার

www.amarboi.org

বিশ্লেষণ করেছেন এবং আত্মার অমরত্ব, আল্লাহর অস্তিত্ব ইত্যাদি বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষ এমন একটি সৃষ্টি যার জ্ঞান আছে, যে অনুভব করে এবং কাজ করে। মানুষের রয়েছে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষমতা। বিবেক ও কর্তব্যের অনুভূতি মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করে দেয়। যে অনুভব থেকে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ উৎসারিত হয় তাকে বলা হয় অন্তরাত্মা। কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষের অন্তরাত্মা দেখা যায় না। কিন্তু প্রমাণিত নয় বলে অন্তরাত্মার অবস্থান অস্বীকার করা যায়নি। হৃদয়ের যে অনুভব মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখায় তা আসে অন্তরাত্মা থেকে। অন্তরাত্মা আছে বলেই আমরা অনুভব করি আল্লাহ আছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক নামে খ্যাত দার্শনিক ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০) উপলব্ধি করলেন যে, মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বার বার বদলে যায়। আজ ইন্দ্রিয় যা সত্য বলে মনে করে কাল তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান মানুষকে প্রতারিত করতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, মানুষ সবকিছুকে সন্দেহ করতে পারে কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারে না। আত্ম-সত্তার এ প্রতীতি সুনিশ্চিত, সন্দেহাতীত এবং অভ্রান্ত। মানুষের চিন্তাক্রিয়া প্রমাণ করেছে চিন্তাশীল মানুষের অস্তিত্বকে। ডেকার্ট উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষের মনে এমন কিছু ধারণা রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতার বা কল্পনার সৃষ্টি নয়। মানুষের মনে রয়েছে সহজাত কিছু ধারণা। অনন্ত, অসীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কীয় মানব মনের ধারণা একটা সহজাত ধারণা। এ ধারণার জনক মানুষ নিজে নয়। মানুষের মনের সহজাত ধারণার সংস্থাপক হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি আরো উপলব্ধি করেছেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান খণ্ডিত এবং সে কারণে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষ অর্জন করে বুদ্ধি ও বোধির সাহায্যে। বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আলোকে মানুষ ইন্দ্রিয়লব্ধ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞানে রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত হয় না। বুদ্ধি মানুষের জ্ঞানকে বোধির (ইনটিউশন) উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। বোধির আলোকে মানুষ সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু ও ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামগ্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ জ্ঞান মানুষের মনে সমগ্র বিশ্বজগতের নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে প্রতীতির জন্ম দেয়। জার্মান দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) বোধিলব্ধ এ জ্ঞানকে মানুষের অনাবিল সুখ-শান্তির উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বৃটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বিষয়াদির ব্যাখ্যা

www.amarboi.org

করেছেন এভাবে যে, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন কোনো সন্দেহ নেই তখন স্বাভাবিকভাবে শূন্য থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও শূন্য থেকে হঠাৎ আসেননি। সুতরাং মানুষের সৃষ্টিকর্তা পূর্বাপর ছিলেন ও আছেন। তিনি চিরন্তন ও শাশ্বত।

মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। ফলে তার মনে আছে আশা ও আনন্দ। সেই সাথে হতাশা, ব্যথা, বেদনা মানুষকে পীড়া দেয়। মানুষ এসব এড়িয়ে চলতে পারে না। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যেই জীবনকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস মানুষকে আজীবন চালাতে হয়। কিন্তু কেন মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্ম ? দার্শনিকদের মতে মানব-মনের শূন্যতা বোধ থেকে উদ্বেগের জন্ম। কিন্তু কেন এ শূন্যতাবোধ ? কোনো কোনো দার্শনিক মানুষের অনিবার্য মৃত্যু বা অস্তিত্বের বিলুপ্তির চেতনাকে শূন্যতাবোধ ও উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মৃত্যু মানব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে এই বাস্তবতা মানুষকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের অসহায়ত্ব সম্পর্কে মানুষ যখন সচেতন হয় তখন বাস্তবতাকে মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়। মানুষ তখন জীবনকে সফল ও সার্থক করার তাকিদ অনুভব করে। জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করার তাকিদে মানুষকে বেছে নিতে হয় জীবনের লক্ষ ও কর্মপন্থা। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে শূন্যতাবোধ মানুষের মনে নৈতিকতার ভিত্তি সৃষ্টি করে।

পার্থিব জীবন একদিন শেষ হবে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দর করার জন্য মানুষ কোন্ পথ বেছে নেবে এ স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। ব্যক্তি তার বিবেক, বুদ্ধি ও বোধির সাহায্যে ভালো ও মন্দকে পরখ করে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন সংগ্রামে রত হয়। সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য মানুষকে নির্বাচন করতে হয় সঠিক কর্মপন্থা ও জীবনপদ্ধতি। মানুষকে তৈরী করে নিতে হয় সুন্দর জীবনযাপনের সুষ্ঠু পরিবেশ। বেঁচে থাকার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধের। মানুষের কল্যাণের জন্য মূল্যবোধের সৃষ্টি। মানুষ স্বাধীন। কিন্তু নিজের খুশীমত সব স্বাধীনতা ভোগ করবার স্বাধীনতা মানুষের নেই। সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মানবীয় নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারা। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে প্রবৃত্তির বল্গাহীন কামনা-বাসনাকে প্রশ্রয় দেয়া মানবীয় নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। কেননা জীবনকে সুন্দর করা ও মানবতার কল্যাণ কামনা করা প্রতিটি মানুষের ব্রত হওয়া উচিত।

প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) এ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাঁর সমাজ দর্শনে। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের মাঝে রয়েছে সুপ্ত

www.amarboi.org

শক্তি। জনহিতকর কাজে মানুষের সুপ্তশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। মানুষের মাঝে কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরস্পরের সুপ্ত-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনদর্শন মানব মনের সুপ্ত শক্তিকে পরিচালিত করেছে অন্তহীন লোভ ও লালসার চাহিদা পূরণের জন্য। ফলে সমাজ জীবনে একদিকে রয়েছে শোষিত ও বঞ্চিতের হাহাকার, অন্যদিকে সম্পদ-বৈভবে নিমজ্জিত মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে ভোগের সাম্রাজ্যে। পাশ্চাত্য আজ ভোগবাদী জীবনের অনুসারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র আজ দুর্নীতির সয়লাব। সনাতন মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষকে আজ পরিণত করেছে পশুতে। হতাশা ও অশান্তির কালো ছায়া মানব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ গভীর এক গহ্বরে।

ফরাসী দার্শনিক জাঁ-পল সাত্রে তাই আক্ষেপ করে বলেছেন—মানুষ আজ এক মহা সংকটে পড়েছে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো পথ তাঁর জানা নেই। সম্পদের পরিমাণ বাড়লেই মানব মনে শান্তি আসে না। আবার ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও শোষণ বঞ্চনায় জর্জরিত মানুষের মাঝেও মানবীয় মূল্যবোধের সঠিক অনুশীলন সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুধা ও দরিদ্রতা দূর করার সাথে সাথে ন্যায়, সুনীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মানুষকে এসব মানবীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক গুণে গুণান্বিত করার লক্ষে তাই প্রয়োজন একটি নির্ভুল জীবনদর্শন। মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান মানুষের জন্য আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মানুষ তাই আজ নুতনভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে, বৈষয়িক সমৃদ্ধি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ নয়। আবার বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে জীবনকে অস্বীকার করার মধ্যেও মানব জীবনের সার্থকতা নেই।

বস্তুত বৈষয়িক উন্নয়ন ও নৈতিক উন্নয়ন এক সাথে এক লক্ষ্যে ধাবিত হলেই মানুষ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার অনুসারী হতে পারে। ইসলামের জীবনদর্শন মানুষের এ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কারণ ইসলাম শুধু গতানুগতিক ধর্ম নয় বরং একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান ব্যাপক এবং পরস্পর সংগতিপূর্ণ। মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও কর্ম প্রবাহের কোনো দিক সম্পর্কে ইসলাম উদাসীন নয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ইসলামের জীবন বিধানে মানবীয় সকল দিকের দিকনির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে অন্যান্য জীবনদর্শনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূলকথা হলো, "মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে।"

www.amarboi.org

সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ সম্পর্কে ইসলাম আপোষহীন। অবিশ্বাসের দুর্গে চরম আঘাত হানার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। মানুষকে সবরকম অধীনতা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র এক আল্লাহর অধীন করার জন্য ইসলাম ধর্মের আহ্বান। বিশ শতকের বৃটিশ দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ' তাই ইসলামকে তুলনা করেছেন স্বাধীনতার সাথে। তিনি বলেছেন, "ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতা তথা শাসনতান্ত্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার ধর্ম। সামাজিক দিক থেকে সৃষ্ট ধর্ম তার মুকাবিলা করতে পারে না। কোনো ধর্মের সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী সমাজব্যবস্থার মত এত পরিপূর্ণ নয়। মুসলিম জগতের অধপতন হচ্ছে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির ফল। মুসলমানরা আবার যখন শুধু ইসলামের ভিত্তিতেই চেষ্টা-সাধনা করবে, মুসলিম জগত তখন সুপ্তির কোল থেকে জেগে উঠবে।"

ইসলাম যে জীবনদর্শন মানবতাকে উপহার দিয়েছে তার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদে বিশ্বাসী মুসলমানগণ তাই মানুষকে মানুষের অধীনতা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর অধীন হবার জন্য আহ্বান করে থাকে। অদৃশ্য এক শক্তির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করার পর মুসলমানরা এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। বিশ্বাসীর এ চেতনাকে আরবী পরিভাষায় "ঈমান" বলা হয়। বিশ্বাস বা ঈমান হলো এমন সব বিষয়কে সত্য বলে মেনে নেয়া যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক সেসব বিষয়কে সত্য বলে মনে করে। মানুষ যা চোখে দেখে, কানে শুনে, স্পর্শ করে থাকে, ঘ্রাণ বা স্বাদগ্রহণ করতে পারে সেসব বিষয়ের উপর বিশ্বাস আনার দরকার হয় না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ যা জানতে পারে সেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের কোনো প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাস বা ঈমান আনতে হয় শুধু অদৃশ্য বিষয়ের উপর। ইন্দ্রিয় যেখানে অক্ষম সেখানেই মানুষকে মেনে নিতে হয় বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের রায়। অতএব বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেক প্রসূত চিন্তা থেকে বিশ্বাসের জন্ম।

অন্ধ বিশ্বাসকে ঈমান বলা যায় না। ইসলাম ধর্মে ঈমানকে জ্ঞান ও আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুফরী বা অবিশ্বাস হচ্ছে মূর্খতা বা অজ্ঞানতা। "আল্লাহ্", "ফেরেশতা", "ওহী" (কিতাব) "নবুওয়াত" ও "আখিরাত" এ পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ের উপর মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে প্রতিটি বিষয়ের সত্যতা মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে আসীন না হলে একজন মুসলমান নিজেকে প্রকৃত বিশ্বাসী হিসেবে দাবি করতে পারেন না। মুসলমানরা মনে করেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা ও সৃষ্টিজগত এক

www.amarboi.org

সার্বভৌম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান শক্তির সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা সমগ্র সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। আল্লাহর অনুগত এক সৃষ্টি-(ফেরেশতা) সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কার্যাদি সম্পন্ন করেন শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কিছু করতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের রয়েছে ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য প্রভৃতি বেছে নেবার ক্ষমতা। ভ্রান্ত ও নির্ভুল উভয় পথেই মানুষ চলতে পারে। ভ্রান্ত, মিথ্যা ও অন্যায় পথ পরিহার করে সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথে মানুষ যদি চলে তাহলে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করবেন। অতএব বিশ্বাসীদের চারিত্রিক ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস মানুষকে প্রকৃত মানুষ হবার জন্য শক্তি ও প্রেরণা দিয়ে থাকে। সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনের জন্য সার্বক্ষণিক তাকিদ মানুষ অনুভব করতে পারে আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট জবাবদিহির চেতনা থেকে।

বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে, সবকিছুর মালিক শুধু আল্লাহ্। পৃথিবীতে মানুষের যাকিছু আছে সব আল্লাহর দান। এমনকি মানুষের যে শক্তি, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা এসবই আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলেই মানুষের সব গর্ব খর্ব করে দিতে পারেন বা চিরতরে নিঃশেষ করে দিতে পারেন। অতএব মানুষের উচিত নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও শক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর নির্ধারিত ও নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা। মানুষ উপলব্ধি করে যে, মানুষের ক্ষমতা ও শক্তি সীমিত, ফলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপা মানুষের প্রয়োজন। মানুষ আরো উপলব্ধি করে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত নিয়ম ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে অপরিবর্তনীয় বিধি অনুসারে চলছে। সব সৃষ্টির মাঝেই লক্ষ করা যায় সতত ক্রিয়াশীল এক বিধান যা অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয়।

পৃথিবী, সৌরজগত, মহাকাশ সম্পর্কে মানুষ যতো বেশী জ্ঞান লাভ করছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সতত ক্রিয়াশীল শৃংখলাপূর্ণ বিধান সম্পর্কে মানুষ ততো বেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে যে, সচেতন এক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে সকল সৃষ্টি। এক মহান কারিগর সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এই বোধ কল্পনা প্রসূত নয় বরং যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক আশ্রিত হৃদয়ের প্রত্যয়ী চেতনা। আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তার একত্ব সম্পর্কে তাই ঘোষণা এসেছে নবী-রাসূলগণের নিকট হতে। যদিও নবী-রাসূলগণ কখনো কখনো কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছেন কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সবাই

www.amarboi.org

একই কথা বলেছেন। যদি সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্পনা আশ্রিত হতো তাহলে নবী-রাসূলদের বর্ণনায় পার্থক্য সৃষ্টি হতো। সকল নবী-রাসূল বলেছেন অদৃশ্য শক্তির কথা যিনি সজ্ঞান সক্রিয় সত্তা, যিনি নিরপেক্ষ বিচারক।

নবী-রাসূলদের এ বক্তব্য মানুষ সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। নবীদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত বাণীকে ধর্মগ্রন্থ রূপে মানুষের নিকট জীবনাচরণের বিধান হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর বাহক হচ্ছেন ফেরেশতা নামক সৃষ্টি। নবীদের বক্তব্যের সত্যতা মানুষকে স্বীকার করতে হলে অবশ্যই 'ফেরেশতা' ও 'কিতাব'-এর উপর বিশ্বাসস্থাপন জরুরী। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে নবীদের নিকট প্রেরণ করেছেন তাঁর বাণী। নবীগণ সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের নিকট। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ওহীর মারফত আল্লাহর বাণী হযরত মুহাম্মদ স.-এর নিকট এসেছে। ওহীর শাব্দিক অর্থ গোপনে জানানো। নবী মুহাম্মদ স.-এর নিকট ওহী গোপনে এসেছে। কিন্তু মুসলমানদের নবী কোনো কল্প-কাহিনীর নায়ক নন। হযরত মুহাম্মদ স. এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যাঁর উপদেশ, শিক্ষা, জীবনকথা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী, খুঁটিনাটি সকল কর্মকাণ্ড, আচরণ সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত দলীলের সাহায্যে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর জীবন-চরিত থেকে তাঁর বাণী ও উপদেশ থেকে মানুষ তাঁকে বিচার করতে পারে।

যুক্তিবাদী ও সত্যাশ্রয়ী মানুষ তাদের বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, মানবতার ইতিহাসে যে মানুষকে ইতিহাস স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ স.। সমাজ-বিপ্লবের এ মহানায়ক শুধু তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা নন বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমাজ বিপ্লবের নেতাও হতে পারেন তিনি। পরিবেশ তাঁকে তৈরী করেনি, বরং তিনি তৎকালীন পরিবেশের অন্ধকার, কুসংস্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি দূর করে গোত্র, বংশ, দেশ, জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা করলেন নৈতিকতাপূর্ণ এক আদর্শ সমাজ। তিনি এমন এক জীবনদর্শন মানুষের নিকট উপস্থাপন করলেন যেখানে সকল পূর্ণতা সমন্বয় লাভ করেছে। শুধু জীবন-দর্শন উপস্থাপন করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি বরং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি এমন একটি মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে নতুন এক সভ্যতার সৃষ্টি হলো। তিনি আবির্ভূত হলেন একজন দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমরনায়ক, আইনবিদ এবং নৈতিক দীক্ষাগুরু রূপে।

দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম-শিষ্টাচার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কলা-কৌশল ও বিধি-কানুন সম্পর্কে তিনি আদর্শ স্থাপন করলেন মানব

www.amarboi.org

সমাজে। সকল কুসংস্কার, অলীক কল্পনা, বস্তুপূজা ও বৈরাগ্যবাদের ধারণা ও বিশ্বাস পরিহার করে তিনি যুক্তি, বুদ্ধি ও বাস্তবমুখী এমন এক জীবনব্যবস্থা প্রচলন করলেন যেখানে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহভীতি বা "তাকওয়ার" ভিত্তিতে। ধর্মের সাথে কর্মের, জ্ঞানের সাথে ধার্মিকতার যোগসূত্র স্থাপন করে তিনি মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন। মানুষকে নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষে পরিণত করলেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ড স্থাপন করে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও চির মুক্তির পথ দেখিয়ে দিলেন।

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সবাইকে এক আল্লাহর দাস হবার জন্য আহ্বান জানালেন এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের চেতনায়। সকল প্রকার যুলুম, নিপীড়ন, অন্যায়, অত্যাচার, হত্যা, সন্ত্রাস, ধোঁকা, প্রতারণার মূল উৎপাটন করে কায়েম করলেন ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ। কিন্তু এ সমাজ কায়েম করতে গিয়ে তাঁকে যুলম ও নিপীড়ন সহ্য করতে হলো। প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেন তিনি। দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। প্রতিহিংসার শিকার হলেন। অনেকের শত্রুতে পরিণত হলেন। কিন্তু শত বিরোধিতা, অসহযোগিতা ও অত্যাচারের মুখে তিনি বিচলিত হলেন না। সত্য মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। মাত্র তেইশ বছরের কর্মময় জীবনে বিস্তৃত মরুভূমির বিক্ষিপ্ত কলহপ্রিয়, সন্ত্রাসী, অসভ্য জনগোষ্ঠীকে আদর্শ জীবনব্যবস্থার প্রভাবে এক অখণ্ড সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনের অধীনে সুসংবদ্ধ ও সংহত করতে সক্ষম হলেন।

জীবন সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ও চেতনার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন তার ফলেই সমগ্র সমাজ জীবনে এ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছিল। বল্গাহীন জীবনকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন জীবনবোধ দ্বারা। শত্রুকে তিনি পরিণত করলেন বন্ধু হিসেবে। মহত্ত্ব, ক্ষমা, বিনয় ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা তিনি বিজয়ী হলেন। কিন্তু এর পরেও তিনি ছিলেন নিরহংকার, নিঃস্বার্থ ও সংযমী জীবনের অধিকারী। পাতার কুটির, চাটাইয়ের বিছানা আর সামান্য আহারে তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। একজন সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট। ফলে তাঁর ইন্তিকালের পর বংশধরদের জন্য কোনো ধন-সম্পদ তিনি রেখে যাননি।

সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে এসব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পার্থিব কোনো স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ স. নবুওয়াতের দাবি করেননি। বরং নবুওয়াত

www.amarboi.org

প্রাপ্তির পর তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছরে–তৎকালীন কলুষিত পরিবেশে তিনি এক পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে অনুভব করতেন প্রচণ্ড আকুতি যাতে করে ধ্বংসপ্রায় এক সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন এক সমাজ গড়া সম্ভব হয়। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী শ্রবণের পরই তাঁর জীবনে সূচিত হলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের। হেরার গুহা থেকে লোকালয়ে এসে তিনি আহ্বান করলেন মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত না করার জন্য। চুরি-ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, যুলম-নিপীড়ন থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বললেন, ঘোষণা করলেন গোত্র, বংশ বা আভিজাত্যের কারণে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নিকটে সত্যাশ্রয়ী ও চরিত্রবান মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও পুরস্কার। তিনি মানুষকে বুঝালেন যে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও সৎকর্মের বিনিময়েই মানুষ চিরমুক্তি ও শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। তখনকার সমাজ ও পরিবেশ এসব যুক্তি ও বাণী গ্রহণ করার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না, ফলে তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল সবাই। তবু অকপটভাবে তিনি ঘোষণা দিলেন।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ط-

"আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে। আমি গায়েবও জানি না। আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যে ওহী আসে, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫০

পিতৃমাতৃহীন নিরক্ষর এক মানব সন্তান প্রবল বিরোধিতার মুখেও যেভাবে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সাহায্যে সমাজে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা কল্পনা নির্ভর হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় নিরীহ এক মানুষ। নেতৃত্ব বা ক্ষমতার প্রতি ছিলেন নির্মোহ। ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রীয়নীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সমাজের লোকের কোনো ধারণা ছিল না। "ওহী", "ফেরেশতা", "কিয়ামত", ইত্যাদি ব্যাপারেও নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কখনো কোনো বক্তব্য তিনি পেশ করেননি। হেরা গুহায় প্রথম নাযিল হলো আল্লাহর নির্দেশ ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-

"(হে রাসূল) পাঠ করো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

www.amarboi.org

এ নির্দেশ পাবার পর থেকে তিনি যেসব বক্তব্য পেশ করলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের নিকট আজো তা অটুট ও মওজুদ আছে। ফলে এ মহামানবের প্রদর্শিত জীবনাদর্শের বিজ্ঞানময়তা সম্পর্কে অনবরত নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষকে চমৎকৃত করে চলেছে। জীবনদর্শন হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্ভবত এই যে, তা নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিক। ইসলামী জীবনদর্শন বিজ্ঞান ভিত্তিক। কারণ এ জীবনদর্শন মানব রচিত নয়। বস্তুত অনাগত ভবিষ্যতে মানুষের জ্ঞান যত অগ্রসর হবে নবী মুহাম্মদ স. প্রবর্তিত জীবনাদর্শের বিজ্ঞানময়তা ততবেশী প্রমাণিত হবে।

লক্ষণীয় যে, মুহাম্মদ স. বাল্যকালে ছিলেন মেষপালক, যুব বয়সে ছিলেন "হিলফুল ফুযল" নামক সংগঠনের সদস্য। যৌবনে একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি একজন বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ও আইন বিশারদরূপে আবির্ভূত হলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আরবভূমির বিরাট এলাকার তিনি হলেন অধিপতি। একজন মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর এতসব গুণের সমাবেশ হঠাৎ করে কিভাবে অর্জিত হল ? পবিত্র কুরআনে এর বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে। নবী বলছেন, "আমার কাছে যে ওহী আসে আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" নবুওয়াতের বিস্ময়কর প্রভাব ব্যতিরেকে আর কোনোভাবেই নবী জীবনের অসাধারণ গুণাবলী ও সফলতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হযরত মুহাম্মদ স. আখেরাতে বা পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের জন্য মানুষের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা "তাওহীদ" ও "রিসালাতে"র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে "আখিরাতে"র প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হলেই নবী-রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসারে নিজের জীবন গড়া সম্ভব। কারণ বিশ্বাসীরা জানেন যে, আল্লাহ্ যে কাজে খুশী হন তা সৎকাজ এবং আল্লাহ্ যে কাজে নারাজ হন তা অসৎকাজ। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসীরা সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হন এ প্রত্যয় নিয়ে যে, দুনিয়াতে যদি সৎকাজের প্রতিফল নাও পাওয়া যায়, পরকালে আল্লাহ্ সৎকাজের বিনিময়ে বিশ্বাসী মানুষকে পুরস্কৃত করবেন। ইসলামী জীবনদর্শনে এভাবে পরকালে বিশ্বাস নৈতিক মান নির্ধারণের সুদৃঢ় ভিত্তি রূপে কাজ করে থাকে। এ জীবনদর্শনে রয়েছে এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেরণা যা মানুষকে পুণ্য ও কল্যাণ অবলম্বন করার এবং ধ্বংস ও বিনাশকে পরিহার করার তাকিদ দেয়। অন্যদিকে পরকালে অবিশ্বাসীরা যখন দেখেন যে, পৃথিবীতে সৎকাজের বিনিময়ে কোনো পার্থিব ফায়দা হাসিল হচ্ছে না তখন তারা দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দুষ্কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিশ্বাসী মানুষ তখন আত্ম-

www.amarboi.org

পূজারী পশুতে পরিণত হয়। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ করায়ত্ত করার জন্য সে তখন দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করে, অপরের অধিকার হরণ করে ; আত্মসাৎ করে থাকে ধন-সম্পদ ইত্যাদি। মানুষ তখন সৎকাজকে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করে। কিন্তু আখিরাতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ এ দুনিয়ায় যা করে তার পুংখানুপুংখ বিবরণ সংরক্ষিত হচ্ছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন তা পেশ করা হবে। সেদিন ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডে সব কাজের বিচার করা হবে। বস্তুত যুক্তি ও বিবেকের দাবি হচ্ছে এই যে, সকল সৎ ও অসৎকাজের ইনসাফ ভিত্তিক বিচার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে সব কাজের পুরস্কার বা শাস্তি মানুষ পায় না, সেহেতু পরকালের বিচার মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য।

পরকালে যারা অবিশ্বাস করে তাদের প্রশ্ন ঃ

ءَ اِذَا ضَلَلْنَا فِى الاَرْضِ ءَ اِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ

"আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাব, তারপর কি আমরা নতুনভাবে জন্ম লাভ করবো ?"–সূরা আস সাজদাহ ঃ ১০

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

(ক)

فَانْظُرْ اِلَى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

"আল্লাহর রহমতের নিদর্শন লক্ষ করো, যমীন মৃত হবার পর কিভাবে তিনি জীবন দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকেও অবশ্য জীবন দান করবেন। তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"

–সূরা আর রূম ঃ ৫০

(খ)

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○

"তারা বলে হাড়গোড় গলে যাবার পর কে আবার তাকে জীবিত করবে ? বলে দাও এসব তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার জীবন দান করেছিলেন।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮-৭৯

www.amarboi.org

(গ)

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط

"তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন ? তারপর এভাবেই তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর একাজ আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজতর।"–সূরা আর রূম ঃ ২৭

বস্তুত শূন্য অবস্থা থেকে যদি আল্লাহর পক্ষে সবকিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে পুনঃ সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। এ সাধারণ কিন্তু বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে আল্লাহ পরকালের বিশ্বাসহীনদের জবাব দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি উদ্দেশ্য। অনর্থক ও লক্ষহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টিজগতের সবকিছু একদিন ছিন্নভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বর্তমান সৃষ্টিজগত চূড়ান্ত বা চিরস্থায়ী নয়। নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ সমগ্র সৃষ্টিজগত নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তন করছে। কিন্তু একদিন সব বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে সংঘর্ষমুখর হবে। সৃষ্টিজগত লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু চিরতরে বিলুপ্ত হবে না এবং নবসৃষ্টির ধারাক্রমও বন্ধ হবে না। এ বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঃ

(ক)

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

"তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে একটি বিশেষ আইনের অধীন করে দিয়েছেন। এসবই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে।"–সূরা আর রাআদ ঃ ২

(খ)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

"যখন সূর্যকে ঢেকে দেয়া হবে, তারকাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং পাহাড়গুলো চালিত করা হবে।"–সূরা আত তাকভীর ঃ ১-৩

(গ)

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ـ

"যমীন ও পাহাড়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে এবং একই আঘাতে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৪

www.amarboi.org

(ঘ)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ـ

"যেদিন যমীন পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ যমীনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে আসমানকেও। আর সবাই এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে এসে উপস্থিত হবে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে সৌরজগত ও মহাকাশের অনন্ত রহস্য সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশী জানতে পারছে। ফলে সৃষ্টিজগতের ধ্বংস বা পুনঃ সৃষ্টি অসম্ভব বা অবাস্তব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। সবকিছুর আলোকে বিচার করলে ইসলামী জীবনদর্শন যেসব অদৃশ্য বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা মানুষের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে করা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সর্বোপরি যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের রায় অনুযায়ী নবী মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়াতকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং নবী প্রদর্শিত পথ ও পন্থাকে যদি মানবতার জন্য কল্যাণকর বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে "আল্লাহ", "ফেরেশতা", "কিতাব" ও "আখিরাত" বা পরকালের বিশ্বাসকে যুক্তিহীন বলে মনে করার আর কোনো কারণ থাকে না।

www.amarboi.org

ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা

ইসলাম মানব জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পথ ও পাথেয়। মহান সৃষ্টিকর্তা সমগ্র মানবতার জন্য যে বিধান দিয়েছেন তার নাম ইসলাম। ইসলাম আমাদেরকে বলে দেয় কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মানব জীবনের পরিণতি কি। সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের অবস্থান কোথায় এবং কোন্ গন্তব্যে কোন্ পথে হওয়া উচিত মানুষের পথ পরিক্রমা। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আত্মিক আচরণের সঠিক পথনিদেশনার নাম হচ্ছে ইসলাম। আরবী ভাষায় ইসলাম অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা ও তা মেনে চলাকেই ইসলামের অনুসরণ করা বলে। আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান ও নির্দেশনাকে যারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মেনে চলেন তারাই প্রকৃত অর্থে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং মুসলমান নামের যোগ্য। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানরা মনে করেন যে, আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব-মানবতার মুক্তি। মানব জীবনের চরম কাঙ্ক্ষিত যে বিষয় তা হচ্ছে শান্তি। বিশ্বাসী মুসলমানরা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি আনার একমাত্র পথ ও পাথেয় হিসেবে ইসলামের দিকনির্দেশনা মেনে চলেন। এজন্য ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম।

বিশ্বাসী মুসলমানরা উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বচরাচরে সতত শান্তি বিরাজমান শুধুমাত্র এক আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার কারণে। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা সবাই চলে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে। এ নিয়মটি হচ্ছে আল্লাহর আইন। সৃষ্টিজগতের সবকিছু যদি আল্লাহর আইন অনুসারে চলে তবে মানুষের জন্যও অবশ্যই আল্লাহর আইন মেনে চলা অপরিহার্য। প্রকৃতির নিয়মে সবকিছু নিয়ম ও শৃংখলা মাফিক চলছে অথচ সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তা মানবে না এটি হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে কারণ এছাড়া তাদের কোনো বিকল্প পথ নেই। সূর্য ইচ্ছা করলেই দেরী করে উঠতে পারে না। পূর্ব দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক হতে সে ওঠে না। নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দিষ্ট গতিপথে সবকিছু চলছে বলেই পৃথিবী ও বিশ্ব চরাচরে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তি। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ সেখানে ব্যতিক্রম। নিয়ম

www.amarboi.org

ভংগকে সে বাহাদুরী মনে করে। বেআইনি কাজ করে সে লাভবান হতে চায়। অন্যকে ঠকিয়ে ও শোষণ করে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে চায়। সে বুঝতে আগ্রহী নয় যে, এর দ্বারা সে নিজেরই ক্ষতি করছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট একদিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে, বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। মানুষ এভাবে পথভ্রষ্ট হয়। অথচ আল্লাহ মানুষকে ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন এবং সেই সাথে তাকে দিয়েছেন ভাল ও মন্দ বুঝবার মত বুদ্ধি ও বিবেক। সত্য ও মিথ্যা তথা ভাল ও মন্দ হতে সত্য ও কল্যাণের পথ বেছে নেয়ার এখতিয়ার ও দায়িত্ব তার। মানুষকে এ স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান। পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা অনন্ত সুখের সন্ধান পাবে। যারা উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হবে তারা শাস্তি পাবে। তাদের পাপ বা অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি পাবার পর একদিন হয়তো সে পরিত্রাণ পাবে— যদি সে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। এদিকে মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজের জীবন গড়তে পারে, তবে সে ইহকালে পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে। পরকালেও তার জন্য হবে শান্তির জীবন।

মানুষ সাধারণত সত্য ও সুন্দরের পূজারী। দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, নম্রতা, ভদ্রতা, সততা ইত্যাদি মানবীয় গুণ মানুষ তা অস্বীকার করে না। আবার হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, যুলুম, পরনিন্দা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কপটতা, মিথ্যাচার, চুরি ইত্যাদি যে বদগুণ তাও মানুষ জানে। মানবীয় সৎ গুণরাজির বিকাশ হোক, অসৎ ও অমানবীয় গুণের বিনাশ হোক মানুষ স্বভাবত তাই কামনা করে। মানব মনের এ প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি। সত্য ও সুন্দরের জয় এবং অসত্য ও অসুন্দরের পরাজয় বিশ্বাসীরা কামনা করেন ; কারণ তারা পৃথিবীতে শান্তি চান। এ কামনা বিশ্বাসীদের সহজাত কামনা। আর এজন্যই ইসলামকে বলা হয় প্রকৃতির ধর্ম।

ইসলাম ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৎকর্মে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৎকর্মে পরস্পরকে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিপক্ষে চিরন্তন সংগ্রামকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় জিহাদ। সত্য কথা বলাকেও উত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

www.amarboi.org

ইসলাম ধর্মের অনুসারীকে সাতটি মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করতে হয়। এ মৌলিক বিশ্বাসগুলো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। সর্বপ্রথম যে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা জরুরী তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস। আমাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যিনি এক, অদ্বিতীয় ও চিরন্তন।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপনের সাথে সাথে মুসলমানদের বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি সর্ব শক্তিমান ও দয়াবান। তিনি আদি ও চিরন্তন। সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আছে, কিন্তু আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সবকিছুর বিনাশ হবে, কিন্তু আল্লাহ অবিনশ্বর। তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন। তিনিই একমাত্র আরাধনাযোগ্য। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা মানুষকে মেনে চলতে হবে। তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং তাঁর একত্ব ও সকল গুণাবলীতে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম। মহান সৃষ্টিকর্তার সকল গুণাবলী মানুষের নিকট যতোবেশী পরিস্ফুট হবে মানুষ ততোবেশী আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, শ্রদ্ধাশীল ও অবনত হবে। মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত এ মনোভাব জাগরুক হবে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান অনুসারে আমাদের জীবন গড়তে হবে। পুরিপূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশের মাঝেই সে খুঁজে পাবে জীবনের সার্থকতা।

মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের ফলে বিশ্বাসী মানুষ তখন আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাবান হয়। তার মনের মধ্যে তখন এ বোধ জন্মে যে, পৃথিবীর কোনো শক্তি তার ক্ষতি বা লাভের কারণ হতে পারে না, যদি না তা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতএব, পার্থিব কোনো শক্তির প্রতি মাথানত না করার, অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার অদম্য শক্তি সে পেয়ে থাকে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলে সে আত্মগর্বী বা অহংকারীতে পরিণত হবে। বরং তাকে হতে হবে বিনয়ী ও নম্র। কারণ সে জানে ও উপলব্ধি করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মুহূর্তেই তার সব দর্প, গর্ব ও অহংকার চূর্ণ করে বা খর্ব করে দিতে পারেন।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলে মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না কারণ সে জানে যে, তার সকল অভাব পূরণ করবেন মহান সৃষ্টিকর্তা। অন্যদিকে মানুষ যেহেতু জানে যে, তার সব কাজ সবসময় আল্লাহ দেখছেন তাই মানুষের

www.amarboi.org

উচিত সৎ, নিবেদিত প্রাণ, কর্তব্য পরায়ণ ও কর্মনিষ্ঠ হওয়া। মানুষকে হতে হবে নির্ভীক, তেজস্বী, ধৈর্যশীল ও সাহসী। সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকে মানুষ হতে পারে উদার, মহৎ ও সৃজনশীল। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তার চিন্তার জগতকে প্রসারিত করতে থাকে। সে নিজেকে সংকীর্ণ গোষ্ঠী, জাতীয়তা, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ মনে করে না। সে ভাবে এ পৃথিবীতে সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, সকলকে তিনি সমান ভালবাসেন। সকলের রয়েছে সমমর্যাদা।

মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার কর্মের দ্বারা। বংশ, বর্ণ, জাতীয়তা বা ধন-সম্পদের দ্বারা নয়। প্রকৃত বিশ্বাসীর মন, মনন, চিন্তা ও কর্ম সবকিছুই ধাবিত হতে থাকে একটি লক্ষে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন মানুষ তখন শুধু তাই করতে চায়। সে বর্জন করে সমস্ত পাপ, অন্যায়, মিথ্যা ও অন্ধকারের পথকে। এভাবে একজন বিশ্বাসী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও কর্ম এক সূত্রে গ্রথিত। শুধু মনে মনে বিশ্বাসস্থাপন করা হলো কিন্তু জীবনে এর কোনো প্রয়োগ ঘটলো না এ রকম বিশ্বাস মূল্যহীন। যারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসস্থাপন করেন তাদেরকে অবশ্যই এটি মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ মানুষের জন্য আইন দাতা ও বিধান দাতা। তাঁর প্রদত্ত আইন মেনে চলা আমাদের কর্তব্য।

মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার প্রতিনিধিরূপে তাঁর নির্দেশিত পথ ও পন্থায় জীবনযাপনের জন্য। কিন্তু মহান আল্লাহ দায়িত্ব পালনের বিষয়টি মানুষের স্বেচ্ছাধীন করেছেন। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করলে তা পালন করতে পারে আবার তা অস্বীকার করতেও পারে। কিন্তু যারা অস্বীকার করবে তারা শাস্তি পাবে। কোন্ পথ অবলম্বন করলে, কি পরিণতি হবে মানুষকে এ জ্ঞান তিনি দিয়েছেন তার অনুগত ফেরেশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের নিকট। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীর সব মানুষের নিকট যুগে যুগে আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন।

মানুষের ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা পরিবর্তনের অধিকার মানুষকে দেয়া হয়নি। মানুষের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা ও বাস্তবায়িত করা। ভাল বা মন্দের মধ্যে যে কোনোটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে কিন্তু নিজের মনগড়া আইন অনুসারে সে জীবনযাপন করবে এবং আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন এমনটি হতে পারে না।

www.amarboi.org

মানুষের ভাল মন্দ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন সৃষ্টিকর্তা। কোন্টি ভাল ও কোন্টি মন্দ তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। তিনিই নির্ধারণ করেন মানুষের পরিণতি। আমাদের ভাল কাজের জন্য তিনি পুরস্কৃত করেন। তিনি শাস্তি দেন মন্দ কাজের। মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না চূড়ান্ত বিচারের দিন কি ফায়সালা হবে তার নিজের কর্মের। তাকে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করতে হবে, আন্তরিকভাবে চাইতে হবে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে যেন সে ইহ্কালীন ও পরকালীন উভয় জীবনে তার কর্মের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মানুষের সকল কাজের ও সকল চিন্তার একমাত্র লক্ষ হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মানুষ যখন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর নির্দেশিত পথ ও পন্থায় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে সক্ষম হয় তখনই সে পরিপূর্ণ কামিয়াবী অর্জন করতে পারে।

আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসস্থাপন করার পর মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে রিসালাত ও নবুওয়াতে বিশ্বাসস্থাপন করা। মানুষের সাথে আল্লাহর যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের জীবনকে সুখময় ও শান্তিময় করার জন্য বিধিবিধান দিয়েছেন তার নির্বাচিত প্রিয় মানুষদের মাধ্যমে। নবী রাসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে আহ্বান করেছেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা না করার জন্য। নবী-রাসূলগণ মানুষকে শিখিয়েছেন কিভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে, কিভাবে সবার সাথে আচরণ করতে হবে, কিভাবে পরস্পরের সাথে ভালো কাজের সহযোগিতা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করতে হবে এবং কিভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এ কাজটি নবীদের মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন, কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত।

মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি কি হবে সে জানে না, ফলে সে পৃথিবীতে প্রায়শ অন্যায় কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। মানুষের অধিকার হরণ করে। পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে বিভ্রান্ত হয়। মানুষের এসব দুর্বলতার কারণেই আমাদের সৃষ্টিকর্তা দয়াপরবশ হয়ে মানুষের জন্য "আদর্শমানব"-কে নবী-রাসূলের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। নবী-রসূলগণ আমাদের জন্য সাবধানকারী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন কিতাব বা মহাগ্রন্থ। মুসলমানদের জন্য নবী মুহম্মদ স.-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে আল কুরআন। কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানরা অবগত হয়েছে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

www.amarboi.org

মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সকল নবী-রাসূলকে সমান সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। কারণ এরা সকলেই মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। প্রথম মানব হযরত আদম আ. একজন নবী ছিলেন, তার পর আরো অনেক নবী এসেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ স.। তিনি সমগ্র মানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য নবী-রাসূলদের নিকট বাণী প্রেরণ করেছেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে। সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশতা। আলোর সৃষ্টি ফেরেশতাকুল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সব কাজ করে থাকেন। তাদের স্বাধীন কোনো চিন্তা শক্তি নেই। আল্লাহর হুকুম মানাই তাদের কাজ। আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ কোনো কাজ করার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু মানুষের ভাল ও মন্দ বুঝার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব মানুষকে শেষ বিচারের দিন তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে।

সাধারণত ফেরেশতাদের আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে তারা মানুষের রূপ ধরে এ পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারেন। প্রত্যেক ফেরেশতার নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। তারা অনবরত তাদের সেই কাজ করে থাকেন। যেমন, "কিরামান কাতিবিন" ফেরেশতা মানুষের সকল কাজ ও সকল কথা সংরক্ষণ করে থাকে। মানুষের সকল কর্মের হুবহু প্রতিচ্ছবি শেষ বিচারের দিন পরিস্ফুট হবে। এরই ভিত্তিতে মহান আল্লাহ সকলের বিচার করবেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম লাভের রায় প্রদান করবেন। আল্লাহর বাণীসমূহ যেভাবে জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী স.-এর নিকট এসেছে তা সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে কুরআন নামক মহাগ্রন্থে। আল্লাহর বাণী যেসব মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে কুরআন সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় অটুট রয়েছে।

কুরআনকে বলা হয় মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামী আইনের প্রধান সূত্র হচ্ছে আল কুরআন। কুরআনকে মানবতার চিরন্তন বিধান হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। কারণ মহানবী স.-এর পর আর কোনো নবী আসবে না। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। কুরআনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে মানুষ। মানব জীবনের লক্ষ ও চূড়ান্ত গন্তব্য যে তিনটি মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে তা বর্ণিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। এ বিশ্বাস হচ্ছে তাওহীদ বা সৃষ্টিকর্তার একত্ব, রিসালাত ও আখিরাত। যারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ নবীগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন তারা

www.amarboi.org

আল্লাহর আদেশ নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে চান। তারা আখিরাতে বা পরকালে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মহাপ্রলয়ের পর আল্লাহ সব মানুষের নিখুঁত বিচার করবেন এবং কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

"আমি কুরআনের মাধ্যমে যেসব কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য মুক্তি ও রহমতস্বরূপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২

(খ)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز

"আমি এ কুরআন লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৯

(গ)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"তার চেয়ে ভ্রষ্ট ব্যক্তি কে আছে, যে আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মনোবৃত্তির আনুগত্য করে বেড়ায়। অবশ্যই আল্লাহ যালেম লোকদের পথ দেখান না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫০

বস্তুত সত্য ও সুন্দরের দিকে ধাবিত হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত জীবনব্যবস্থাকে মানুষ সর্বাঙ্গে গ্রহণ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের আদর্শের দ্বারা নিজেদের গড়ে তুলবে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের অন্যতম শাখা হচ্ছে পরকাল বা আখিরাতে বিশ্বাস। সাধারণভাবে মানুষ মনে করে যে মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি। যে কোনো মানুষের জন্য যে কোনো সময় মৃত্যুর শীতল স্পর্শ এক অনিবার্য সত্য। একে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। কিন্তু মৃত্যুর পরে আর এক জগত আছে। সেখানে পৃথিবীর সব কাজের বিচার হবে এ বিশ্বাসকেই বলা

www.amarboi.org

হয় আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তারা মনে করেন পৃথিবীর এ জীবন একটি পরীক্ষাক্ষেত্র মাত্র। পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে ইহকালে। অনন্ত জীবনের জন্য মানুষ যদি কোনো প্রস্তুতি ইহকালে গ্রহণ না করে তাহলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পরকালের বিচার এবং পুরস্কার ও শাস্তিরব্যবস্থা মানুষকে শেখায় সৎ ও সুন্দর হতে। বিশ্বাসীদের এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসতে পারে। মোদ্দাকথা আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিজের জীবন গড়ে তুলতে না পারলে মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্বমানবতা।

❒

www.amarboi.org

আল কুরআন ও বিশ্বাস

কোনো সত্য-সন্ধানী ব্যক্তি যদি কুরআন অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হন তবে তাকে পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত চিন্তা ও মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে আন্তরিকতার সাথে কুরআন অধ্যয়ন করা হলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, কুরআন মানব মনে কিছু মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি গেঁথে দেয় যা মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। পবিত্র কুরআনে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ

"এটি এমন একটি কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১

কুরআন মজীদ যেহেতু মানব রচিত গ্রন্থ নয় সেহেতু তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল। যেহেতু কুরআন আল্লাহর বাণী, সেখানে সন্দেহ-সংশয় জাগতে পারে না। কিন্তু কুরআন অধ্যয়নকারী সকলের পক্ষে কুরআন হতে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। যেসব মৌলিক গুণ থাকলে মানুষ কুরআনের আলোকে আলোকিত হতে পারে, আমাদের অনেকের মধ্যেই সেসব গুণাবলী নেই যেমন ঃ

ক. প্রকৃত ভাল ও প্রকৃত মন্দ যাচাই করে চির কল্যাণকর ও প্রকৃত কল্যাণকর বিষয়কে গ্রহণ করার আকুতি।

খ. সৃষ্টিকর্তার নিকট সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে এমন চেতনা।

গ. পারলৌকিক জীবন চিরস্থায়ী এমন বিশ্বাস।

ঘ. কুরআন নির্দেশিত পথই মানবজীবনের জন্য সর্বতোসুন্দর এমন বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কর্ম।

বস্তুত যদি কেউ কুরআন নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবে তার হৃদয়ের সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। সত্য পথ থেকে মানুষ যত দূরে সরে যাবে তার নিকট সত্যের আলো ততো বেশী নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

পবিত্র কুরআনে এদের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ ○ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط

"যেসব ব্যক্তি (সত্যকে) অস্বীকার করেছে, তাদেরকে সতর্ক করা বা না করা সমান। তারা সত্যকে মেনে নেবে না, কারণ আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে, কানে মোহর মেরে দিয়েছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৬-৭

আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাদের হৃদয়ে, কানে মোহর দিয়ে দেন যারা স্বেচ্ছায় সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ভ্রান্ত পথে চলতে আগ্রহী হয়। আমরা যদি আন্তরিকভাবে সত্য সন্ধানী না হই এবং ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে প্রয়াসী হই তাহলে অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। ভ্রান্ত মানুষের এ অবস্থাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি রহিত করেন।"

সত্যের আলো যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন সত্য অনুসন্ধানী মানুষ সহজেই মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রবৃত্তির পূজায় নিমগ্ন ব্যক্তি তার স্বভাব পরিবর্তনে আগ্রহী নয় বলেই সত্যকে অস্বীকার করে থাকে। ভ্রান্তির অন্ধকারে চলার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে এবং স্বেচ্ছায় সে পথে মানুষ যখন অগ্রসর হয়, আল্লাহ্ তাকে সে সুযোগ দেন। সত্য থেকে যারা বিচ্যুত হয় তারা কুরআনের রহ্মত বা আলোকবর্তিকা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এ কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্ বঞ্চিত করেন না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً۔

"আর যে মানবে না দুনিয়ার গুটি কয়েক দিনের সামগ্রী আমি তাকেও দিব।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৬

অতএব ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহ্র করুণাপ্রাপ্ত এ ধারণা ভুল। কুরআনের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন, "সিরাতুল মুস্তাকিম" বা সোজা পথের অনুসারীবৃন্দ বিশ্বাসীগণ। এরা হচ্ছেন মধ্যপন্থী। পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط۔

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পার এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের উপর সাক্ষী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

আল্লাহর নবী স. যেভাবে আল্লাহভীতি ও সত্য-প্রীতির উজ্জ্বল আদর্শ মানব সমাজের জন্য রেখে গেছেন, তার অনুসারীদেরকেও তাদের জীবন-আচরণে আল্লাহভীতি ও সত্য-প্রীতির সর্বোত্তম নমুনা পেশ করা প্রয়োজন। এ ধরনের আদর্শ নমুনা পেশ করতে আমাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, আমরা প্রকৃত অলোকপ্রাপ্ত নই। সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আদর্শ নমুনা হতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করাও মুসলমানদের জন্য জরুরী। আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার জন্য মানুষকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে তাঁর নির্দেশিত পথ ও পন্থায়। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিশ্বাসীদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَيَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ○

"আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি, যেমন রাখাল তার পশুদের ডাকতে থাকে, কিন্তু হাঁক-ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌঁছে না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭১

অর্থাৎ কুরআনের শাব্দিক আওয়াজ নয় বরং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্বাসীদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। নতুবা তারা হবে নির্বোধ জীববিশেষ যারা কেবল আওয়াজ শুনে কিন্তু কি বলা হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত নবী এবং তাঁর মনোনীত ধর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই একজন বিশ্বাসী নিজেকে পৃথিবীর মানুষের সামনে উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মানব মনে করেন না বরং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তারা যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং নিজেদের জীবনে তা প্রতিফলিত করেন। সাথে সাথে তারা জ্ঞানের এ আলোকিত পথে অন্যদেরকে আহ্বান করেন এবং আল্লাহ

www.amarboi.org

নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা প্রচার ও বাস্তবায়নের পথে সকল নিপীড়ন, নির্যাতন সহ্য করেও ধৈর্যধারণ করেন।

মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু হলেন আল্লাহ্ যিনি আকাশজগত ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি আরশের উপর বিরাজমান হয়েছেন।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪

(খ)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে মানব জাতি ! ইবাদাত করো তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মুত্তাকী হতে পারবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১

(গ)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

"আর তাঁর নির্দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্র-দিন ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্য বা চন্দ্র কাউকে সিজদা করবে না। সিজদা করবে কেবল সেই আল্লাহকে যিনি ঐগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা বাস্তবিক তাঁরই ইবাদাত করে থাক।"–সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৭

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, মানুষের একমাত্র প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি মানুষসহ সমগ্র বিশ্বজগতকে আপন করুণা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের ও সকল সৃষ্টির প্রতিপালন করে থাকেন। সমগ্র বিশ্বজগতের নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনা লক্ষ করে মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম

www.amarboi.org

হয়। তাই কুরআনে বার বার আল্লাহর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ইসলাম ধর্মের মূলকথা। আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের সাথে সাথে আল্লাহর সকল ফেরেশতা, আসমানী সকল কিতাব, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীর বা ভাগ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা মুসলমানদের জন্য জরুরী ! পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

"তোমরা পূর্বদিকে মুখ ফিরালে কিংবা পশ্চিম দিকে, তা কোনো প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয়, বরং প্রকৃত পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করে, ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। আর যারা অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে বস্তুত এরাই হচ্ছে মুত্তাকী—পরহেজগার।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

কুরআনে বর্ণিত সকল কথা, তথ্য ও বক্তব্য আল্লাহ জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন নবী মুহাম্মদ স.-এর অন্তরে। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ـ

"(হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো এ কুরআনকে রুহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল) ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের কাছ থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন।"—সূরা আন নহল ঃ ১০২

www.amarboi.org

কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ○

"এরা কি কুরআন নিয়ে গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে না ? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এতে অনেক মতপার্থক্য পাওয়া যেত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮২

মুসলমানরা নিজেদের ঈমান ও আকীদার ব্যাপারে কুরআনের উপর নির্ভর করেছে। সঠিক জীবনাচরণের জন্য সঠিক বিশ্বাস জরুরী। ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে কুরআনের আলোকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। মানুষের আচার-আচরণ তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপর ঈমান-আকীদার রয়েছে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব। তাই বিশ্বাসীদের জন্য আকীদার বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন।

মুসলমানদের প্রথম মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহর উপর ঈমান। মুসলমানরা আল্লাহকে একমাত্র রব (প্রভু) ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

"আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা আছে সবকিছুরই তিনি রব।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৬৫

(খ)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ

"আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা যিনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

(গ)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ـ

www.amarboi.org

"তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।"–সূরা আল হাশর ঃ ২২

(ঘ)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ۝

"আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

(ঙ)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا

"আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করো, আর তার সাথে অন্য কিছু শরীক করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

(চ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু।"–সূরা ফাতিহা ঃ ১

(ছ)

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

"একমাত্র আল্লাহর উপর তোমরা ভরসা স্থাপন করো, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২৩

মুসলমানদের আকীদার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে নবী মুহাম্মদ স.-এর রিসালতে বিশ্বাসস্থাপন। এ বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আল কুরআন। পবিত্র কুরআনে নবী মুহাম্মদ স.-কে লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ج

"আমি তোমাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যেমনভাবে আমি নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৬৩

আরো বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ـ

www.amarboi.org

"(হে মুহাম্মদ!) বলুন, হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের প্রতি নবী হিসেবে সেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৮

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নবী মুহাম্মদকে আরো বলতে বলেছেন ঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ج

"বলো, আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। আমি গায়েব জানি একথাও বলি না। আমি একজন ফেরেশতা এটাও আমি বলি না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫০

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ لا وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

"আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখি না। বলুন আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাঁর আশ্রয় ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়স্থল দেখি না।"–সূরা জিন ঃ ২১-২২

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, নবী মুহাম্মদ স.-এর শরীয়ত হচ্ছে "দীন ইসলাম" যা আল্লাহ মানুষের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف

"আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন।"–সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯

(খ)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

www.amarboi.org

"আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম। আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে গ্রহণ করে নিলাম তোমাদের দীন হিসেবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩

(গ)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

দীন ইসলামের প্রথম মৌলিক দাবি হলো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন। সেই সাথে নবী মুহাম্মদ স.-এর রিসালাতে ও তাঁর শরীয়তের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

"আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও রাসূলের যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩২

মুসলমানরা পরকাল ও কিয়ামতে বিশ্বাস করেন। কিয়ামত হচ্ছে শেষ বিচারের দিন। সেদিন মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে। পুনর্জীবন লাভের পর মানুষ শান্তির নিলয় কিংবা শাস্তির অনলে অনন্তকালের জন্য নিমজ্জিত হবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

"যেভাবে সর্বপ্রথম আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, ঠিক সেভাবে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব। এটি একটি ওয়াদা যা পূরণ করার দায়িত্ব আমার। এ কাজ অবশ্যই আমি করবো।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্যর নির্ভুল বিচার হবে এবং প্রত্যেক মানুষকে তার আমলনামা (কার্যবিবরণী) দেয়া হবে। পৃথিবীতে মানুষ যেসব সৎ ও অসৎকর্ম করেছে, পরকালে তার প্রতিদান দেয়া হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

(ক)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে তাও সে দেখতে পাবে।"
–সূরা যিলযাল ঃ৭-৮

(খ)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

"যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১০২-১০৩

(গ)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য দশগুণ বেশী পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি বদ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে তার সমপরিমাণ প্রতিফল দেয়া হবে। কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬০

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ উন্মুক্ত ময়দানে একত্রিত হবে। সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজ কর্মের হিসাব নেয়া হবে। ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে সবকিছুর নির্ভুল বিচার করা হবে। পবিত্র কুরআনে অপরাধ ও শাস্তির বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চূড়ান্ত বিচার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেয়া হয়েছে। পরকালীন শাস্তির ভয় মানুষকে ইহকালে পাপ ও অপরাধমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। কুরআনের এ বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি মানব সমাজের উন্নতি, প্রগতি ও শান্তির জন্য অপরিহার্য। বস্তুত

www.amarboi.org

কুরআন নাযিলের মৌল লক্ষ হচ্ছে পৃথিবীর বুকে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

মহাপরাক্রমশালী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার চেতনা এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। মানুষ তখন বুঝতে সক্ষম হয় যে, সৎকর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের অন্তরের প্রশান্তি। আমাদের মতো অনুভূতিশীলদের হৃদয়ে এই সত্য যখন ধরা পড়ে তখনই ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন ও চিরকল্যাণকর উত্তরণ ঘটতে পারে অন্যথায় নয়। ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাসসমূহ শুধু কতিপয় ধারণা ও মতবাদই নয় বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়।

কুরআন ভিত্তিক বিশ্বাসসমূহের মর্মকথা এই যে, সৃষ্ট সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ এবং তার অনুগ্রহের ফলেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে, ঈমান আনা ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফিক হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহের ফল। আল্লাহর এ অনুগ্রহ লাভ সম্ভব তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ তাঁর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে পুরোপুরি মেনে নেবে এবং পালন করবে।

পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সুসংবাদ শুধু তাদের জন্য যারা ঈমানের সাথে সৎকাজ করে থাকে। বলা হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط

www.amarboi.org

"(হে নবী!) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫

বস্তুত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। পরকালীন মুক্তির জন্য তথা জান্নাত লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্ম অপরিহার্য। আল্লাহর নিকট মানুষের পসন্দনীয় গুণ হচ্ছে কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন প্রয়োজন। কুরআনের শিক্ষার পাশাপাশি রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ অত্যাবশ্যক। প্রকৃত অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও জীবনবিধির অপর নাম ইসলামী শরীয়ত। ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ হচ্ছে মানবকল্যাণ। যাকিছু মানবতার জন্য কল্যাণকর তা শরীয়ত অনুমোদন করে। মানবতার জন্য যা কল্যাণকর নয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি হচ্ছে আল কুরআন এবং মহানবী স. প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতি।

❒

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও বিধিলিপি

অবিশ্বাসীরা ধর্মকে আফিম-এর সাথে তুলনা করে থাকে। তাদের এ উপলব্ধি সম্ভবত এমন সব ধার্মিকদের দেখে হয়েছে যারা জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্যের পথে মুক্তি খুঁজেছে। অথবা সেই সব অদৃষ্টবাদীরা এ ধারণার জন্ম দিয়েছে যারা সমাজের সকল অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারকে অদৃষ্টের লিখন হিসেবে মেনে নিতে শিখিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কপট বিশ্বাসীরা ধর্মের নামে অধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কেউবা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সমাজের যালেমদের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য মযলুমকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করেছে। সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের খাতিরে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে স্বার্থভোগী সমাজপতিদের বর্ম হিসেবে। ফলে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা চেতনা থেকে মানুষের মন ও মনন দূরে সরে গেছে। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে ধারণ করার পরিবর্তে মানুষকে ব্যর্থ ও বিমুখ করা হয়েছে। জীবনের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার ফলে জীবন সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে—প্রকৃত মানুষ হতে পারেনি। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানকে ধারণ করতে হবে মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, চিন্তা ও চেতনায়। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করে জীবনকে পরিচালিত করার জন্য একজন বিশ্বাসীকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। অতএব একজন বিশ্বাসীর জন্যে "বিধিলিপি" কর্ম বিমুখতার জন্ম দিতে পারে না বরং সংগ্রামময় জীবনের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা পৌরহিত্যবাদ বা বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাস করেন না। কারণ প্রতিটি মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার নিজের কর্মের জন্য। মানুষ একমাত্র আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর। মধ্যবর্তী কোনো মানুষ বা বিকল্প কোনো কিছুর নিকট মানুষের ধর্ণা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ভাগ্য নিয়ন্তা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর মানুষকে নির্ভর করতে হয়, তাঁর করুণার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। মানুষের কর্মভিত্তিক ফলাফল একমাত্র আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন। এ বিশ্বাসকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'তাকদীর'-এর প্রতি বিশ্বাস। তাকদীর বা ভাগ্য লিখন এর অর্থ এই নয় যে, সমাজে একজন অন্যায়কারী অন্যায় করতে থাকবে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি শুধুমাত্র

www.amarboi.org

অত্যাচারিত হবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সমাজে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে আর শোষিত ও বঞ্চিতরা বিধিলিপি হিসেবে শোষণ প্রক্রিয়াকে মেনে নেবে এ বক্তব্য ইসলামের শিক্ষার প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য সার্বিক সংগ্রাম করা ইসলামের অনুসারীদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। বিশ্বাসীদের জন্য সংগ্রাম বিমুখ জীবন ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব, বিশ্বাসীরা ধর্মকে আফিম নয় বরং ব্যক্তিজীবন ও সমাজ পরিবর্তনের এক বৈপ্লবিক জীবনবিধান হিসেবে মনে করেন।

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাসের একটি অংশ। ভাগ্য বা বিধিলিপির উপর বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবীতে যাকিছু ভালো ও মন্দ আছে অথবা ভবিষ্যতে হবে তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং সবই তার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সীমিতভাবে ভালো-মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ এ স্বাধীনতা অনুযায়ী যাবতীয় কাজ করে থাকে তাঁর জ্ঞাতসারে। আল্লাহ্ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন। অতএব ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরা ধর্মীয় জীবনবিধান অনুযায়ী নেক আমল করার জন্য তাকিদ অনুভব করেন। বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে ধর্মীয় জীবনবিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। ভালো কাজ করে যাওয়া বিশ্বাসীদের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। ফলাফলের জন্য পেরেশান হওয়া বিশ্বাসীদের কাজ নয়। কারণ বিশ্বাসী মানুষকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, নেক আমলকারীদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। এছাড়া প্রকৃত বিশ্বাসীরা ইহকালীন প্রাপ্তির চাইতে পরকালীন পুরস্কারের জন্যই বেশী লালায়িত এবং সে লক্ষেই তাঁরা সৎ ও সুন্দর জীবনের অভিলাষী।

আল্লাহ্ কাকে কিভাবে পুরস্কৃত করবেন তিনিই জানেন এবং সে জন্যই বলা হয় আল্লাহ যার জন্য যা লিখে রেখেছেন তা খণ্ডন করার শক্তি কারো নেই। পৃথিবীতে তিনি কাকে কিভাবে সম্মানিত করবেন বা অপদস্থ করবেন শুধু তিনিই জানেন। তিনি কাউকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। বিশ্ব-প্রকৃতির কোনো অণু-পরমাণু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গতিশীল বা ক্রিয়াশীল নয় এবং কোনো সূক্ষ্ম বস্তুর কার্যক্রম ও গতিময়তা তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আল্লাহ্ যার জন্য যা নির্ধারিত করেন তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তা পরিবর্তিত হবার নয়। বিশ্বাসী মানুষ ভালো কাজ করেন আল্লাহর

www.amarboi.org

সন্তোষলাভের জন্য। অতএব মহান আল্লাহ মানুষের কর্মফল ইহকালে ও পরকালে কাকে কতটুকু দেবেন বিশ্বাসীরা তা ভেবে হয়রান বা পেরেশান হন না, বরং তাঁরা ধৈর্যের সাথে সৎকাজ করে যেতে আগ্রহী। কারণ, তারা জানেন পরম করুণাময় আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হতে নেই।

বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের বিশাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন সামগ্রিকভাবে সার্বিক কল্যাণের লক্ষে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সমগ্র ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম ও রহস্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের বোধগম্য নয়। মানুষের উপর আপতিত বিপদ, দুর্যোগ যখন আসে তখন তারা দিশেহারা হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এসব দুর্বিপাকের কোনো কল্যাণকারিতা ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য মানুষের বোধগম্য না হলেও বিশ্বাসীরা মনে করেন, "আল্লাহ যাকিছু করেন কল্যাণের জন্যই করেন।"

কোনো কোনো কার্যক্রমের যৌক্তিকতা মানুষের বোধগম্য হোক বা না হোক, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সত্যের প্রতি অবিচল থাকা বিশ্বাসীদের অপরিহার্য গুণ। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে, মহান সৃষ্টিকর্তা সব বিষয়ে বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত। অতএব মানুষের বোধশক্তির দ্বারা সকল কার্যকরণের লক্ষ, উদ্দেশ্য বা ফলাফল উপলব্ধি করা বা না করার উপর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কোনো হেরফের হতে পারে না।

বিশ্বজগত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার ফলে মানুষের পক্ষে কোনো ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্ন ঘটনার দ্বারা সেই কার্যক্রমের পরিণতি ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একজন সাধারণ মানুষ যা দেখে ও উপলব্ধি করে তা সমগ্র বিশ্বজগতের আলোকে নয় বরং একান্তভাবে অতি সংকীর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির আলোকে। ফলে অনেক সময় কেন দয়াময় আল্লাহ মানুষকে দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন তা বোধগম্য হয় না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ একথা বুঝতে সক্ষম যে, আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার উপর বিস্তৃত এবং মানুষ এ বিশাল সৃষ্টিজগতের এক ক্ষুদ্রতম অংশে বাস করছে। পৃথিবী নামক ক্ষুদ্র এক গ্রহের অধিবাসী মানুষের পক্ষে মানুষের সকল দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের কারণ ও ফলাফল জানা সম্ভব নয়। এ কারণে প্রকৃত বিশ্বাসীরা ব্যক্তি বা সমাজের বিভিন্ন বিচ্যুতি ও বিপর্যয়ের জন্য আল্লাহকে দায়ী করেন না। বিশ্বাসীরা জানেন যে, মানব মনের সকল

www.amarboi.org

অনুভূতি আল্লাহর সৃষ্টি। মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া ও সকল অনুভূতি মানুষের মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে মানুষের মন যখন ব্যথিত হয় তখন আল্লাহ তা জানেন ও বুঝেন। কিন্তু তার পরেও তিনি পৃথিবীতে রোগ-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির দ্বারা মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে থাকেন। সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এসব ঘটতে পারে তা মানুষ বুঝতে সক্ষম। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের অনেক দুঃখ, কষ্ট ও দুর্যোগের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। মানব সৃষ্ট দুঃখ, কষ্ট বা অন্যায় অবিচারের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করা যায় না। কারণ আল্লাহ মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চান না বা নিশ্চুপ হয়ে থাকতেও বলেন না। আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা পৃথিবীর সকল উপকরণ ও শক্তির সাহায্যে মানুষের কল্যাণের জন্য যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে।

অতএব প্রতিটি মানুষের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে নিজের অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস সংগ্রাম করা। মানুষের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মানুষকেই সংগ্রাম করতে হবে। আল্লাহ চান মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে যেন সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন মানুষ যেন অবশ্যই তা পালন করে ও মেনে নেয়। অতএব নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে মানুষ মুক্তির ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ নির্দেশিত "সিরাতুল মুস্তাকিম" হচ্ছে সেই পথ যা মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ কেন সবাইকে সত্যপথে চলার তাওফিক দান করেন না বা সুযোগ সৃষ্টি করে দেন না ? কেন মানুষের মন বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ায় ? বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ানো কিংবা সত্য পথে অবিচল থাকাটাই কি মানুষের বিধিলিপি ? মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয় তখন কেন মানুষের মনকে দয়াময় আল্লাহ সত্যের দিকে ফিরিয়ে দেন না ? প্রকৃত বিশ্বাসীরা এসব প্রশ্নের অবতারণা করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, "সিরাতুল মুস্তাকিম" বা সহজ-সরল পথ মাত্র একটি। এ পথের সন্ধান মানুষ লাভ করতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের মাধ্যমে। যদি মানুষ মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথের বিপরীতে যাত্রা করে তখন সে কিছুতেই আর সঠিক পথ খুঁজে পায় না। আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

www.amarboi.org

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

"আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করতে চান, তার হৃদয়কে (তিনি) ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে গোমরাহ্ রাখতে চান তার হৃদয়কে এমনি সংকীর্ণ করে দেন ; যেন সে ঊর্ধলোকে উঠে চলে যাচ্ছে। এভাবেই অবিশ্বাসী লোকদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে অপবিত্রতা চাপিয়ে দেয়া হয়।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২৫

যে কোনো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ যেমন আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম তেমনিভাবে যে কোনো জ্ঞান-পিপাসু মানুষের পক্ষেই সত্য ও অসত্য তথা সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্য অনুধাবন করা সহজ। দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি আলোর পথে না গিয়ে অন্ধকার পথে পা বাড়ায় তবে পথভ্রষ্টতা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় অন্ধকার জগতে বিচরণ করে আল্লাহ্ তখন তাকে আর আলোর জগতে প্রত্যাবর্তন করেন না। মানুষ যদি সুপথে চলতে আগ্রহী হয় তবে অবশ্যই তাকে আলোর জগতে এসে সঠিক সরল-সহজ পথটি খুঁজে নিতে হবে।

আল্লাহ্ মানুষকে এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যেন সে সুপথ প্রাপ্ত হয় সাধনার দ্বারা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

"যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে তাদেরকে আমি সুপথ দেখাই।"
–সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯

কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন করা হয় কেন আল্লাহ্ মানুষকে চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সুপথ দেখালেন না ? একজন বিশ্বাসী এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেন না কারণ তিনি আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ্র প্রতি তিনি বিনীত। বিশ্বাসীরা এও জানেন যে, মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তি সমগ্র সৃষ্টিজগতের কার্যকরণ ও ব্যবস্থাপনার সবকিছু উপলব্ধি করতে অক্ষম। একজন অবিশ্বাসীর মনেও এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হয় না, কারণ নাস্তিকগণ আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। এ প্রশ্ন সম্ভবত তাদের মনেই উদয় হয় যারা প্রকৃত বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কোনোটাই নয়। সংশয় থেকে এ প্রশ্নের

www.amarboi.org

উৎপত্তি। আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকার ফলে সংশয়বাদীদের মনে এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হতে পারে। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারীরা বিশ্বাসী হন এবং বিশ্বাসীরা সুপথ প্রাপ্ত শুধুমাত্র হন চেষ্টা-সাধনার দ্বারা।

"ইসলাম" নবী মুহাম্মদ স. কর্তৃক আনীত এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীর সব মানুষ তা আপনা আপনি অনুসরণ করবে। ইসলামের সত্যতা ও বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্যও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির সংগ্রাম করতে হয় যেন সৎ পথে চলবার ইচ্ছাশক্তি মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হতে থাকে।

জীবনকে সুন্দর করবার আকুতিই মানুষকে জীবন সংগ্রামে রত থাকা। জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু বাস্তবে "ইসলাম" মুসলমানদের জন্য যে জীবন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে আমরা সে জীবন পদ্ধতি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের অনেকের মধ্যে ইসলামের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই এবং এ ব্যাপারে আগ্রহ অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ না জেনে, না বুঝে ইসলামের অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়।

ইসলামের অনুসারী হতে হলে মানুষকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তা গ্রহণ করতে হয়। যদি কেউ স্বেচ্ছায়, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, নবী মুহাম্মদ স.-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তিনি নিজের জীবনকে এবং জীবনের সকল কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর নির্দেশ অনুযায়ী তথা ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে থাকেন।

এ প্রসংগে নবী মুহাম্মদ স.-এর একটি বাণী স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "বিশ্বাসের মর্ম সেই ব্যক্তি গ্রহণ করেছে যে আল্লাহকে প্রভু ও প্রতিপালক হিসেবে, মুহাম্মদকে পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং ইসলামকে নিজের জীবন পদ্ধতি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন, "আমি যে হেদায়াত এনেছি যতক্ষণ না তোমাদের ইচ্ছা-সাধনা তার অধীন হয় ততক্ষণ তোমাদের একজনও মুসলমান হতে পার না।" এ বক্তব্যের পরিষ্কার অর্থ এই যে, প্রকৃত মুসলমান হতে হলে তাকে নবী মুহাম্মদ স.-এর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত "জীবন বিধান" অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

একজন মুসলমান যখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হন, নবী মুহাম্মদ স.-কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তার সকল কর্মকাণ্ড ইসলামের নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। সীমা অতিক্রম করা প্রকৃত বিশ্বাসীর

www.amarboi.org

পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামকে নিজের জীবনপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার পর জীবনের কর্মকাণ্ডকে যে কোনো পথে পরিচালিত করার কোনো অধিকার আর মুসলমানদের থাকে না।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুসলমানদের অবশ্য করণীয়। সেই সাথে নবীর আদর্শ, তথা আদেশ, নির্দেশ মেনে চলা বিশ্বাসীদের জন্য অতীব জরুরী। কেননা আল কুরআনে এসব নির্দেশ মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে ঃ

(ক)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে। এ আদর্শ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে পাবার এবং আখিরাতে নাজাত লাভ করার আশা পোষণ করে।"–সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ২১

(খ)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

"আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যাকিছু থেকে দূরে থাকতে বলেন তার থেকে নিজেকে দূরে রাখ এবং ভয় করো আল্লাহ্‌কে। অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"
–সূরা আল হাশর ঃ ৭

নবী মুহাম্মদ স. নিজে এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ

"যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে আহ্বান করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা পালন করবে। আর যেসব বিষয় থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলি, সেসব থেকে দূরে থাকবে।"–বুখারী, মুসলিম

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"তিনি তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ এবং খাঁটি জীবন-বিধানসহ পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, রাসূল সেই খাঁটি জীবন-বিধানকে অন্যান্য সকল জীবনবিধানের উপর বিজয়ী করেছেন—মুশরিকগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও।"–সূরা আস সাফ ঃ ৯

অতএব নবী মুহাম্মদ স.-কে নেতা তাঁর প্রদর্শিত পথকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে ইসলামী জীবন-বিধান (দীনে হক) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি বিশ্বাসীকে তার সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য এ প্রচেষ্টা চালানো হলেও বিশ্বাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী জীবন বিধান পৃথিবীর বুকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে অত্যাচারিত মানব সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচার দূর করা সম্ভব হবে। সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের পরিবর্তন আনার জন্য বিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম অতি উত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

"তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি। বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি তোমরা আস্থা স্থাপন কর।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

(খ)

... وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ ـ

"... তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, যতদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩

(গ)

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

www.amarboi.org

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তা পরিবর্তন করে।"

–সূরা আর রাআদ ঃ ১১

(খ)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

"যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে আমি তাদেরকে পথ দেখাই।"

–সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯

ইসলামী সমাজব্যবস্থা কোনো অবাস্তব অলীক কল্পনা যেমন নয় তেমনি অলৌকিক কোনো ঘটনার দ্বারা এ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। সামগ্রিক গণচেতনা ও গণজাগরণ ছাড়া জীবনপদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন হয় না। অতএব প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ করতে হয়। প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে এমন চরিত্রের অধিকারী হতে হয় যেন অন্য সব মানুষ বুঝতে পারে যে, বিশ্বাসীরা নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ, ন্যায়নিষ্ঠ, ত্যাগী, আদর্শবাদী এবং আল্লাহ্ ভীরু। সেই সাথে মানুষ যেন বুঝতে সক্ষম হয় যে, বিশ্বাসীরা এমন একটি জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত যে জীবনব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। ভাগ্যের উপর সমর্পণ করে কর্ম বিমুখতা ইসলামের কাম্য নয়। বরং সমাজব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতির তথা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনাই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাজ।

❐

www.amarboi.org

বিশ্বাসের ভিত্তিমূল

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ-

"আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন ইহকালে ও পরকালে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

এর অর্থ, বিশ্বাসীরা যে কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করেন তা দৃঢ় ও অনড় বৃক্ষের মত। এটি এমন একটি উক্তি যা বিশ্বাসীকে মর্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এ উক্তি যেমন চিরকাল চির অম্লান, তেমনি বিশ্বাসীদের চিরমুক্তির পাথেয়। তবে শর্ত এই যে, শুধু মৌখিক উচ্চারণ নয়, বরং তা হতে হবে আন্তরিক।

"লা ইলাহা ইল্লালাহ"-এর প্রকৃত মর্মবাণী পরিপূর্ণরূপে বুঝতে না পারলে কালেমার ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত হয় না। বিশ্বাসের ভিত্তি যত দুর্বল হয়ে থাকে জীবনাচারণেও মানুষ ততো বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। পদে পদে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ তার সঠিক পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়।

নবী মুহাম্মদ স. একবার সমেবত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, "বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাসীদের দৃষ্টান্ত। বল দেখি এটি কোন্ বৃক্ষ ?" ইবনে ওমর বর্ণনা করেন যে, কারো নিকট হতে কোনো জবাব না পেয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, "এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।" খেজুর গাছ যেমন দৃঢ়ভাবে মাটি আকড়ে মজবুত ও অনড় থাকে, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীকে তদ্রূপ পার্থিব কোনো বিপদাপদ টলাতে পারে না।

প্রকৃত বিশ্বাস মানুষকে যাবতীয় নোংরামি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যায়েদ ইবনে আকরাম রা. বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে "লা-ইলাহা ইল্লালাহ" উচ্চারণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "আন্তরিকতার অর্থ কি ? তিনি বললেন, "যখন এ বাক্য মানুষকে হারাম ও অবৈধ থেকে বিরত রাখবে তখনই তা আন্তরিকতার সাথে হবে।"–কুরতুবী

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী যে কোনো মানুষের জন্য ঈমান ও আকীদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের উপর ঈমান আকীদার রয়েছে বিরাট প্রভাব। মানুষের সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা নিয়ন্ত্রিত

www.amarboi.org

হয় ঈমান ও আকীদা দ্বারা। যেহেতু একজন বিশ্বাসীর জন্য আকীদার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু ইসলাম ধর্মের আকীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল ধারণা থাকা বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য। শিরক বা অংশীদার মিশ্রিত আকীদা একজন বিশ্বাসীর সমস্ত সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়। একজন মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী তার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে তার আকীদা। আকীদা ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক বিষয়। সঠিক জীবনাচারণের জন্য সঠিক আকীদা অপরিহার্য। মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন এবং তার সকল ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, তাকদীর ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মুসলমানগণ আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে তিনি হচ্ছেন সকল সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং মহানিয়ন্ত্রক। তিনি হচ্ছেন এক এবং একমাত্র ইলাহ্ বা উপাস্য। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, অন্য সবকিছু বাতিল ও অসত্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

"আসমান ও যমীন এবং এ দু'টির মাঝখানে যা আছে সবকিছুরই তিনি রব। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদাত করো এবং ইবাদাতের পথে ধৈর্যের মাধ্যমে অবিচল থাকো। তাঁর সমতুল্য কোনো সত্তার কথা তুমি জান কি ?"–সূরা মারইয়াম ঃ ৬৫

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(ক)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج -

"আল্লাহ্ চিরঞ্জীব এক শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

(খ)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ

www.amarboi.org

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রভাবান্বিত, মহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাকিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"–সূরা হাশর ঃ ২৩-২৪

(গ)

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا

يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

"সাহায্যের সব চাবিকাঠি তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, স্থল ও জলপথে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যা সম্পর্কে তিনি জানেন না। আর্দ্র ও শুষ্ক প্রতিটি দ্রব্য এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

পবিত্র কুরআনে এসব ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ স্বীয় সত্তা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা সর্বৈব সত্য এবং এসব বিশ্বাস করা বিশ্বাসীদের একান্ত কর্তব্য বা ফরয। কারণ আল্লাহ্র বাণীই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, সত্য এবং পরিপূর্ণ। তার বাণীকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংশয় অথবা প্রত্যাখান করার ব্যাপারে কোনো অজুহাত উপস্থাপন করা যায় না। কেননা, কুরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই সত্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ

اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

www.amarboi.org

"এরা কি কুরআন নিয়ে গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে না ? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেতো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮২

কুরআনের বাণী যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেও কোনো বৈপরিত্য নেই। কুরআন ও নবীর সুন্নায় কিংবা কোনোটাতেই পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। এ ব্যাপারে যদি কারো কোনো সংশয় বা সন্দেহ থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা, বুঝবার অক্ষমতা, চিন্তার অপরিপক্কতা রয়েছে। এদের উচিত হবে আরো বেশী জ্ঞান সাধনা করা যাতে সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন বাণী রয়েছে। আল্লাহর এসব গুণাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার মধ্য দিয়েই মানুষ বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে দৃঢ় ও মজবুত করতে পারে। আল্লাহর রয়েছে বহু পবিত্র নাম ও গুণাবলী। সূরা ফাতিহার প্রথম শব্দ "আলহামদু লিল্লাহ" (সকল প্রসংশা আল্লাহর)। কারণ আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বচরাচরের যে কোনো প্রশংসা করা হলে তা আল্লাহর প্রশংসা বলে গণ্য। কেননা সব সৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে এক অদৃশ্য সত্তার বিজ্ঞানময় সৃষ্টি। সব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি একক শাশ্বত সত্তা। অতএব সব প্রশংসার একমাত্র হকদার সেই অনন্ত অসীম শক্তি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"এমন কোনো সৃষ্টি নেই যা আল্লাহর প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪

তবে পৃথিবীতে একমাত্র মানুষকেই নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে স্রষ্টার আনুগত্য ও হুকুম আহকামের পাবন্দ হবার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর প্রতি মানুষের বিশ্বাসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে তার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থার উপর, সৃষ্টিকর্তার সকল গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা আসে না। অতএব, প্রকৃত বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকর্তা, সব কাজের মহা নিয়ন্ত্রক, তিনি প্রকৃত ও একমাত্র উপাস্য, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি পরম করুণাময়, মহান ও পবিত্র। তিনি শান্তির ধারক ও নিরাপত্তার মালিক। তিনি সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি সকল জীবের

www.amarboi.org

রিযিক সৃষ্টিকারী। দৃশ্য অদৃশ্য সব গুণের অধিকারী একমাত্র তিনি। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা। তিনি একদিন মানুষের সকল ভাল ও মন্দ কাজের বিচার ফায়সালা করে পুরস্কার ও শাস্তি দান করবেন।

আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর বিষয়ে মানুষ জেনেছে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুসারে। তাই বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী। এ বাণীর সাহায্যে আল্লাহ মানুষকে সত্য ও সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন। নবী মুহাম্মদ স.-এর নিকট জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে যে বক্তব্য আল্লাহ প্রেরণ করেছেন পবিত্র কুরআনে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী সম্বলিত বক্তব্য প্রদান করেছেন একজন মানুষ। এ মানুষটি কে ? তিনি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ স.। তিনি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। কিন্তু এ বাণী প্রেরণের উদ্দেশ্য কি ? এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ع

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯০

আল্লাহ মানুষকে কিছু কিছু কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। সুবিচার, সদাচরণ ও নিকট জনের প্রতি অনুগ্রহ করার আদেশ দেয়ার পাশাপাশি বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে দূরে থাকে। বিশ্বাসীদের এসব আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে সদা সচেতন কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

প্রথমেই বলা হয়েছে ইনসাফ বা সুবিচার এর কথা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েমের কথা সদাসর্বদা সজোরে উচ্চারিত হলেও বাস্তবে সাম্য ও সুবিচার কায়েমে মানুষের ব্যর্থতার কারণ এই যে, মানব জীবনের মৌলিক ভিত্তি ও লক্ষ অনুসারে সুবিচার কায়েমের প্রচেষ্টা মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি। সাম্য ও সুবিচার কায়েমের জন্য মানুষকে প্রথমত স্রষ্টার প্রতি, নিজের প্রতি এবং সকল সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করতে হবে। যে ব্যক্তি স্রষ্টার প্রতি ও নিজের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়, তার পক্ষে সকল সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না।

www.amarboi.org

স্রষ্টার প্রতি সুবিচার করার অর্থ সৃষ্টিকর্তার হক বা অধিকারকে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসার উপর অগ্রাধিকার দেয়া। বিশ্বাসীগণ আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে এবং যাবতীয় নিষেধ ও গর্হিত কাজ হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার হক আদায় করে থাকেন। সৃষ্টিকর্তার হক আদায় করা হলেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি সুবিচার করা হয়। আর মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি সুবিচার করতে পারে তখন সে প্রকৃত অর্থে নিজের প্রতি সুবিচার করে থাকে। কেননা আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করার ফলে মানুষ নিজের চারিত্রিক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংস থেকে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। নিজের শারীরিক ও আত্মিক ক্ষতির কারণ হয় এমন কোনো কাজ সে করে না। সে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। সন্তুষ্টি ও সবরের দ্বারা আত্ম-উন্নয়নের পথকে সুগম করা সম্ভব হয়।

বিশ্বাসী মানুষের প্রকৃত কাজ হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের জন্য যাকিছু কল্যাণকর তা অবলম্বন করা এবং অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। এ দু'টি কাজকে জীবনের লক্ষ হিসেবে মানুষ যদি গ্রহণ করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবীতে রয়েছে তার বহু দায়-দায়িত্ব। এসব দায়-দায়িত্বের মধ্যে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিজের বিশ্বাস ও অঙ্গীকার অটুট রাখা। বিশ্বাসীদের জন্য প্রধানতম অঙ্গীকার হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি কাজ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবে। মানুষের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হয় না, যদি না আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আমরা জানি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, মান-সম্মান কোনোটিই প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে না। আমাদের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। এ দুনিয়ায় যে যতবেশী ধন-সম্পদ, মান-সম্মানের ও আরাম-আয়েশের অধিকারী হোক না কেন, কোনোদিন সে তৃপ্ত হয় না। সবসময় মনে হয় প্রাপ্তিতে অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। মানুষ কখনোই পার্থিব অর্জনে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির দ্বারাই বিশ্বাসীদের প্রকৃত তৃপ্তি এসে থাকে। বিশ্বাসীরা তাই মানবীয় দুর্বলতাসমূহ কাটিয়ে জীবনের লক্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন। জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ নির্ধারণের ফলে জীবনের চলার পথে এদেরকে হতে হয় সৎকর্মশীল এবং ধৈর্যশীল। এ দু'টি অপরিহার্য গুণ অর্জন ব্যতিরেকে বিশ্বাসীদের পক্ষে লক্ষ অর্জন করা সম্ভব নয়। সৎকর্মশীলতা ও ধৈর্যশীলতা

www.amarboi.org

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক তেমনি শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুস্তাহাব ইত্যাদি পুণ্যময় কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও ধৈর্যশীলতার শামিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশ্বাসীরা যখন তাঁর সকল অপসন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হন তখনই তারা প্রকৃত বিশ্বাসীতে তথা প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফে নবী মুহাম্মদ স.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ط اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

"অতএব আপনি এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলুন যেমন আপনাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমালংঘন করবেন না। আপনারা যাকিছু করেন নিশ্চয় তিনি এর প্রতি দৃষ্টি রাখেন।"
—সূরা হূদ ঃ ১১২

এ আয়াতে নবী মুহাম্মদ স.-কে এবং সকল মুসলমানকে তাদের সকল কাজে, সর্ব অবস্থায় "ইস্তেকামাত" অর্থাৎ দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সরল পথে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ স.-কে এবং তার অনুসারীদেরকে সর্ব অবস্থায় আকায়েদ (ধর্মীয় বিশ্বাস), ইবাদাত, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, ব্যবসা, বাণিজ্য, উপার্জন, ব্যয় এবং নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁর নির্দেশিত সরল পথে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের এসব কাজ নির্দেশিত সীমার বাইরে করা হলে তা হবে সোজা পথ হতে বিচ্যুতি।

মানব জীবনে আজকে আমাদের যত পরাজয়, গ্লানি এবং অধঃপতন, তার মূল কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে "ইস্তেকামাত" (দৃঢ়তা) অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে ইস্তেকামাত না থাকার ফলে আমরা শরীয়ত পরিপন্থী যাবতীয় কাজে সহজেই লিপ্ত হয়ে পড়ি। মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ (তাওহীদ), পবিত্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ স. যে জ্ঞান আমাদের মাঝে বিতরণ করেছেন তা আমরা উপলব্ধি করতে এবং জীবনাচরণে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছি ফলে দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহারে আমরা মধ্যপন্থী দল হিসবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না।

www.amarboi.org

বস্তুত ঈমান-এর উপর সুদৃঢ় থাকা মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। কোনো মানুষ যখন কোনো অন্যায় করে, প্রকৃত অর্থে তখন তার ঈমান থাকে না। একজন প্রকৃত ঈমানদারের পক্ষে ঈমান থাকা অবস্থায় কখনোই শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করা সম্ভব নয়। একজন বিশ্বাসী যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দীনের অনুশাসন মেনে চলতে পারে তখনই সে পরিপূর্ণ কামিয়াবি লাভ করতে পারে। দীনের অনুশাসন না মেনে ঈমানদার হওয়ার দাবি করা হাস্যকর। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি তাই "ঈমান" এবং এর উপর সুদৃঢ় ভাবে অটল থাকা। হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আকাফী রা. নবী মুহাম্মদ স.-কে একবার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষাদান করুন যেন আপনার পর আর কারো কাছে কোনো জিজ্ঞাসার প্রয়োজন না হয়। নবী বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং ইস্তেকামাত (দৃঢ়তা) অবলম্বন করো।"–মুসলিম

সাধারণভাবে আমরা প্রতিনিয়ত ছোট, বড় নানা ধরনের অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি। ছোট ছোট অন্যায় ও পাপ আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়া যায় সৎকর্ম ও ইবাদাতের মাধ্যমে পুণ্য অর্জনের ফলে। কিন্তু বড় ধরনের অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। বিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্ক। আল্লাহর পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শির্ক বলে।

শির্ক বহুভাবে হতে পারে যেমন—আল্লাহর জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার মনে করা বড় ধরনের শির্ক। এ ধরনের কোনো ধারণা পোষণ করা মহা অন্যায় এবং চরম মূর্খতা। মানুষ অনেক সময় ছোট ধরনের শির্ক করে ফেলে। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশংকা করি তার মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক হচ্ছে ছোট শির্ক।" সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া হচ্ছে ছোট শির্ক।" রিয়া অর্থ লোক দেখানো ইবাদাত। মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে একমাত্র লক্ষ মনে না করে সৎকর্ম ও ইবাদাত মানুষের প্রশংসা অর্জনের প্রত্যাশায় করে থাকে তখন তা শির্ক-এ পরিণত হয়। ফলে বিশ্বাসীদের এসব ইবাদাত ও সৎকার্য শুধু ব্যর্থ নয় বরং পাপের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে।

ছোট, বড়, সব ধরনের শির্ক থেকে বিরত থাকা বিশ্বাসীদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষের মধ্যে কি ধরনের গুণাবলী থাকলে শির্ক থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর অনুগত বিশ্বাসী বান্দাদের গুণাবলী নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ

www.amarboi.org

ক. একজন প্রকৃত বিশ্বাসী তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইচ্ছা, আকাংখা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত বিধি-নিষেধের আলোকে। তার চেতনা ও কর্ম অনুযায়ী যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

খ. একজন প্রকৃত বিশ্বাসী, বিনয়ী ও নিরহংকারী জীবন যাপন করেন। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি কোনো মোহ বা মায়া তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ফলে ঔদ্ধত্য বা অহংকার হতে তিনি হন মুক্ত।

গ. অজ্ঞানতার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত কিংবা যারা বিভ্রান্ত তাদের প্রতি বিশ্বাসীগণ রুষ্ট হন না। বরং তাদের নিকট শান্তির বাণী পৌঁছে দেন একজন বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, বিধর্মীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করাও বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ।

ঘ. একজন প্রকৃত বিশ্বাসী, দিন-রাত্রির সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করেন এবং পরকালের কঠিন আযাবের কথা ভেবে ভয় পান। ফলে অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদাতে মগ্ন থাকতে ভালবাসেন।

ঙ. একজন বিশ্বাসী ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেন। অপব্যয় বা কৃপণতার দ্বারা তিনি কখনো স্বীয় চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেন না।

চ. আল্লাহ্র অনুগত বিশ্বাসী বান্দা কখনো পাপের নিকটবর্তী হন না এবং ইবাদাতে কখনো আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেন না।

ছ. বিশ্বাসীগণ মিথ্যা পরিহার করে চলেন এবং না জেনে না বুঝে কোনো কাজ করেন না।

জ. বিশ্বাসীগণ নিজেদের চারিত্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যদের বিশেষ করে নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারে সকল সদস্যদের চারিত্রিক সৎগুণাবলী উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকেন।

পবিত্র কালেমার প্রতি বিশ্বাস মানুষকে এভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সন্তোষ অর্জনে সচেষ্ট হন। সৃষ্টিকর্তার সন্তোষ অর্জনে তারাই সফলকাম হন, যাদের রয়েছে চারিত্রিক দৃঢ়তা বা ঈমানের দৃঢ়তা। ঈমানের দৃঢ়তা ব্যতিরেকে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমানের দৃঢ়তা আনয়নে সাহায্য করবেন যদি আমরা নিজেরা সেই দৃঢ়তা অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই এবং প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

www.amarboi.org

মানব উন্নয়নে ইসলামী শরীয়াহ্‌র ভূমিকা

সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান দুরাবস্থার জন্য যদি কাউকে দায়ী করা হয় বা প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হয়, তবে সম্ভবত প্রধান কারণ হিসেবে ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে মুসলমানদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করা যায়। ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করার ফলে মুসলমানরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইসলাম থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ্‌ আজ শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্ব মুসলিম আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দোসরদের গোলাম বা ক্রীড়নক হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত ধারক ও বাহকগণ আজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় তাদের অভিলাষকে মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। মানবতা, মানব মর্যাদা বা মানবাধিকারের কথা যতই উচ্চারিত হোক না কেন, ইসলামকে একটি সামাজিক শক্তি বা বিপ্লবী চেতনা হিসেবে যদি কেউ বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয় তবে অংকুরেই তা বিনষ্ট করার জন্য পাশ্চাত্য আজ ঐক্যবদ্ধ। এর ফলে পাশ্চাত্যের নিকট মুসলমানদের সমাজে তারাই কাংখিত যারা তাদের স্বীয় আদর্শ সম্পর্কে নির্বিকার এবং ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

স্বীয় আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনাকে বিজর্সন দিয়ে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের সেবাদাসগণ তাই আজ মুসলমানদের সমাজে মর্যাদার ও ক্ষমতার অধিকারী। নিরন্ন ও নিরক্ষর প্রধান মুসলিম সমাজে ইসলামের মূল চেতনাকে তুলে ধরার প্রয়াস প্রায়শঃই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে কিংবা সম্পূর্ণ সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে পারেনি। এ ব্যর্থতার মূল কারণ ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তি।

"আমরা মুসলমান" একথা ভেবে অনেক আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান আনন্দ বোধ করেন। কিন্তু এদের মধ্যেও ইসলামের বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সমাজের তথাকথিত মর্যাদাবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা এগুলো জানার জন্য কোনো তাকিদও অনুভব করেন না। ফলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ইসলামের অনুসারীদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন ইসলামের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তোলা।

www.amarboi.org

বিশ্বাসভিত্তিক প্রার্থনা এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বিধিমালা রয়েছে; ইসলামের সামষ্টিক আদর্শ বা বিধিমালাকেই শরীয়ত বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইহকাল ও পরকালে মানুষের সার্বিক কল্যাণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ইহকালীন প্রতিটি কাজের পরকালীন ফলাফল রয়েছে। ইহকাল হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং পরকাল প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র। ইহকালীন কাজের প্রতিফল কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ ইহকালেও পেতে পারে। কিন্তু তার পরেও পরকালীন প্রতিফল পাওয়া বন্ধ হয় না। তাই বিশ্বাসী মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সুখে, দুঃখে, গোপনে, প্রকাশ্যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা।

কিছু অংশ গ্রহণ কিছু অংশ বর্জন করা হলে শরীয়ত পালিত হয় না। তাই বিশ্বাসীদের উচিত সমগ্র শরীয়তকে সামষ্টিকভাবে পালন করা। আজকের সমাজে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার প্রকৃত কারণ সামষ্টিকভাবে শরীয়তের বিধি-বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগে মুসলমানদের ব্যর্থতা। কেননা শরীয়াত বিশেষ কোনো সময়ের জন্য নয়, বরং সর্বকালে, সকল অবস্থায় সকল বিশ্বাসীর জন্য শরীয়ত পূর্ণাংগ বিধান হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। কোনো কালেই শরীয়ত পুরাতন ও প্রয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

শরীয়তের বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ প্রদত্ত আইন বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সামনে রেখে সার্বিক মানব কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। শরীয়তের বিধি-বিধান তাই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন যা আধুনিকতম সমাজের সব চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। একথা সত্য যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী ও মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়তের লক্ষ হচ্ছে সমাজে আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ তৈরী করা এবং তাঁদের দ্বারা সমাজকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শরীয়তের বিধি-বিধান এমনভাবে রচিত হয়েছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার কালেও সর্বোচ্চমানের এবং সার্বিক সুন্দর সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন সমকালীন সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনে রচিত। সে কারণে এসব আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন।

যেহেতু আল্লাহর আইন রচিত হয়েছে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষে সেহেতু শরীয়তের বিধি-বিধান সমাজ বিবর্তনের যে কোনো

৭—

www.amarboi.org

অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য। শরীয়তের মৌলনীতিসমূহ কখনো পরিবর্তন বা সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। মানব জীবনধারা বা দেশ কালের অবস্থা যতই পরিবর্তিত হোক, সময়ের স্রোত যতই প্রবাহিত হোক, শরীয়তের নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকে। শরীয়তের নীতিমালার ভিত্তিতেই প্রয়োজ নীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা তাই প্রয়োজন।

সমাজের প্রয়োজনে যত আইনই রচিত হোক না কেন তাকে অবশ্যই শরীয়তের মৌল নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই অজ্ঞতা, হীনমন্যতা অথবা নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে বর্তমানকালে শরীয়ত অচল বলে দাবি করেন। তাদের মতে শরীয়ত আধুনিককালের বিধান হবার যোগ্যতা হারিয়েছে।

কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করে থাকেন যে, শরীয়তের কোনো কোনো বিধান এ যুগে অচল। শরীয়তের অনুরূপ আইন আধুনিক কালের কোনো আইনে নেই এ যুক্তিতে এ ধরনের মত প্রকাশ করা হয়। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা এবং হীনমন্যতাবোধ থেকে মুসলমানদের মধ্যে এসব ধারণার উৎপত্তি। কেউ কেউ শরীয়তকে একালে অচল বলে থাকেন শুধু এ কারণে যে তা প্রয়োগ করা হলে নিজেদের উপর এর প্রয়োগ ঘটবে। শরীয়তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার লক্ষে এবং প্রচলিত আইনের ফাঁক দিয়ে নিজেদের অপরাধকে ঢেকে রাখার জন্যই এদের এহেন প্রয়াস।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"তোমরা মানুষকে ভয় করো না, ভয় করো কেবলমাত্র আমাকে। তোমরা আমার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিও না। আর যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের মৌল নীতিমালার সাথে সংঘর্ষশীল আইন-কানুনের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তবু বর্তমানকালের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য শরীয়তের কিছু কিছু বিধানের কার্যকারিতা, বাস্তবতা ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

www.amarboi.org

১ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মানুষের উপর মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় শুধুমাত্র চারিত্রিক গুণাবলীর মানদণ্ডে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ط

"নিসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেন, "সমস্ত মানুষ একটি চিরুনীর কাঁটাসমূহের মত সমান। আরবের কোনো মর্যাদা নেই অনারবের উপর তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ভিন্ন অন্য কোনো হিসাবে।"

২ ইসলামী শরীয়তে নিরংকুশ ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষ সুবিচার করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কতিপয় নির্দেশ এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

ক

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط .

"তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

খ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف

"কোনো বিশেষ শ্রেণীর বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কোনোরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

গ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ج

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সকলে সুবিচার ও ন্যায়নীতি নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, সে সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের পিতামাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয় যদি তারা ধনী কিংবা গরীবও হয়। এদের অপেক্ষা আল্লাহই তো

www.amarboi.org

উত্তম। অতএব তোমরা নফসের খায়েসের অনুসরণ করতে গিয়ে অবিচার করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

৩ ইসলামী শরীয়তে চিন্তার স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা লক্ষ করা যায়। 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।' নবী মুহাম্মদ স.-এর বাণী—'অত্যাচার শাসকের সামনে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ।'

৪ ইসলামী শরীয়তে মদ, জুয়া প্রভৃতি ক্ষতিকর বিষয়কে হারাম বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ—"হে ঈমানদার লোকেরা! নিশ্চয় জানবে মাদকদ্রব্য, মদ্যপান, জুয়াখেলা, বেদী স্থাপন ও গণনা অপবিত্র ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা তা পরিহার কর।"

৫ ইসলামী শরীয়তে সামষ্টিকভাবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি দল থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে এবং ন্যায়ের প্রবর্তন, প্রতিষ্ঠা করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।"

(ক)

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ .

"লোকদের ধন-সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।"–সূরা আয্ যারিয়াহ ঃ ১৯

(খ)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

"ধনশালী লোকদের নিকট থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করো এবং এ করে তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং এর দ্বারা তাদের পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত করে তুলবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩

৬ ইসলামী শরীয়ত খাদ্য দ্রব্য অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে আটকে রাখাকে এবং অবৈধ পন্থায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তোমরা শাসকদের নিকট ঝুঁকে পড়ো না এ উদ্দেশ্যে যে তোমরা জেনেশুনে লোকদের ধন-মালের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ

www.amarboi.org

করবে।" নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "কেবল ভ্রান্ত ও অপরাধী ব্যক্তিই খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত ও আটক করে রাখতে পারে।"

শরীয়তের অসংখ্য বিধি-বিধানের মধ্যে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, শরীয়তের সকল নীতিমালাই সামগ্রিকভাবে সর্বকালের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। অতএব, অজ্ঞতা, হীনমন্যতা বা চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে আমাদের মধ্যে যেসব বিভ্রান্তি আছে তা দূর করা জরুরী। ইসলামের দণ্ডবিধি, বিশেষ করে চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে সাধারণত দ্বিধা ও আতংক লক্ষ করা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তের এসব শাস্তির বিধান দৃষ্টান্তমূলক এবং সে কারণেই কঠোরতম।

এছাড়া শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের সার্বিক সতর্কতা অবলম্বনের বিধান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়েই ইসলামের আইনকে কেউ কেউ বর্বর যুগের আইনের সাথে তুলনা করেছেন। ব্যভিচারের শাস্তি নিজস্ব স্বীকারোক্তি কিংবা অন্তত চারজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য ছাড়া এ দণ্ড দেয়ার বিধান নেই। ঠিক একইভাবে চুরির জন্য শাস্তির বিধান সম্ভব সেই সমাজে, যেখানে শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

শরীয়তভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজে অপরাধীদের জন্য শরীয়তের আইন প্রযোজ্য। অতএব সমাজব্যবস্থার, প্রশাসনের ও বিচার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না করে শুধু দণ্ডবিধি চালু করলে তা ইনসাফপূর্ণ হবে না। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজের উদরপূর্তি করা যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে শাস্তির প্রয়োগ ঘটবে প্রথমে সমাজের বিবেকহীন বিত্তবানদের ক্ষেত্রে।

অতএব ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিরন্ন সাধারণ মানুষের জন্য দণ্ডবিধি প্রয়োগের পূর্বে সেইসব বিত্তবানদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটবে, যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও অবৈধভাবে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনায় আমাদের জন্য এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য ইসলামী শরীয়ত একটি বাস্তবধর্মী বিধান। ইসলামী শরীয়ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইসলামের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগী ও মৌলিক নীতিমালা রয়েছে। মৌলনীতিমালা ভিত্তিক শরীয়তের বিধি-বিধান পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ।

www.amarboi.org

মানবজীবন, এর বিভিন্ন প্রয়োজন এবং কর্ম প্রবাহের কোনো দিক সম্পর্কে ইসলাম উদাসীন নয়। ইসলাম বাস্তব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন আবেগপ্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন নয়, তেমনি জীবনকে ধর্মীয় ও জাগতিক এভাবে ভাগ করাকেও ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু দীর্ঘদিন হতে ইসলাম অনুসারীদের কেউ কেউ ইসলামকে নিছক আবেগ বা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রাখার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়াস চালাচ্ছেন।

জীবনের বিভিন্নমুখী কার্যাবলী থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং ইসলামকে একটি আবেগ ভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মরূপে প্রমাণ করা হচ্ছে এ ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ। সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনামলে অনেক মুসলিম প্রধান দেশে এ প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে। ফলে এ সমস্ত দেশে ইসলামী শরীয়াহকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না বরং শরীয়তকে বড়জোর ব্যক্তিগত আইনে পরিণত করা হয়েছে।

তবুও বিশ্বের প্রকৃত বিশ্বাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কিছু আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্যে ইসলামী শরীয়ত নয়। মানব রচিত আইন দিয়ে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে এবং ব্যক্তিগত কিছু আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্যে আল্লাহর বিধানের প্রয়োজন, এ যুক্তি নিতান্ত হাস্যকর। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপর আরোপিত এক চরম অবমাননা।

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ শুধু জীবনের খণ্ডিত একদিক সম্পর্কে বিধান অবতীর্ণ করবেন এবং অন্য সকল দিকের জন্য মানুষকে নিজের খেয়াল খুশী মত স্বেচ্ছাচারী, নীতিহীন মতবাদ ও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে বলবেন এ যুক্তি অসার।

বস্তুত ধর্ম যদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পথপ্রদর্শনের দ্বারা চলার পথকে সহজ ও সরল করতে না পারে তাহলে মানব জীবনে এর প্রয়োজনীতা ও ভূমিকা ফুরিয়ে যায়। যুক্তিবাদী মানুষ তাই ধর্ম ও জীবনকে আলাদাভাবে দেখতে পারেন না কিংবা এটাও মনে করেন না যে ধর্ম জীবনের এক সংকীর্ণ পরিসরে 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার হিসেবে আবদ্ধ থাকবে।

পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা থেকে মুসলমানদের সমাজে ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে যে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীরা তা যুক্তির সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় আপ্লুত কিছু তথাকথিত মুসলমান বুদ্ধিজীবী বা প্রগতিবাদীগণ আরো একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রায়শই বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, জাগতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যয়বাদ বা বিশ্বাসভিত্তিক বিধি-বিধানের প্রাধান্য দেয়া হলে তা বস্তু-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করবে।

www.amarboi.org

এ ধরনের বক্তব্য বাস্তবভিত্তিক নয়। ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম জ্ঞান ও সভ্যতার বিকল্প নয় বা বিরোধী নয়। ইসলাম বস্তুজগত, এর আইন ও গতি-প্রকৃতি ও সম্ভাবনাময়তার প্রতি মানুষকে উৎসাহী করবার জন্যে ব্যক্তি চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা বিশাল সৃষ্টিজগতের বিজ্ঞানময়তার প্রতি মানুষকে চিন্তা করার জন্য উৎসাহী করা হয়েছে। ফলে ইসলামের অনুসারীরা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতাকে সাবলীলভাবে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিশ্বাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহ নিরংকুশভাবে সর্বজ্ঞানের অধিকারী। অতএব তিনিই পারেন মানব জীবনের জন্য নির্ভুল জীবনবিধান তৈরী করতে। আল্লাহ্ মানুষকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। মানুষ তার এ শক্তিকে শুধুমাত্র সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করবে এটাই শরীয়তের বিধান। শরীয়ত মানুষের চিন্তা-শক্তিকে দমিয়ে রাখার জন্য নয়।

কিন্তু শরীয়তের বিধি মানুষের জন্য প্রয়োজন এজন্য যেন মানুষ শুধু মানব কল্যাণেই তার সকল শক্তি ব্যয় করে। তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তি দমন করার পরিবর্তে আল্লাহ্ মানুষের জন্য এমন এক "জীবনব্যবস্থা" দিয়েছেন যেন মানুষ বল্গাহীন স্বাধীনতার ফলে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে পড়ে। তিনি মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে বিবেকের সাহায্যে নীতিমালার মধ্যে পরিচালিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি কার্যকরীভাবে এ জীবনপদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তাহলেই সে বস্তুবাদী জগতের উপর মানবীয় নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হবে এবং যান্ত্রিকতাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বর্বরতা থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে।

মানবীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলীকে অটুট রেখে সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইসলাম একটি বেগবান শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এর জন্য বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার সংশোধন প্রয়োজন। সমাজকে ভারসাম্যপূর্ণ করার লক্ষে যেসব সংস্কার করা হবে তাতে আধুনিক সভ্যতার কল্যাণময়তা ও শুভ দিকসমূহকে বর্জন করা হবেনা। বস্তুবাদ মানুষের চিন্তাজগতে যে হীনতা ও দীনতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে মানুষকে তা থেকে মুক্ত করে মানবিক মূল্যবোধকে পুনর্জীবিত করার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত মানবাত্মাকে রক্ষা করবে আধুনিক সভ্যতার নিষ্পেষণ থেকে, কিন্তু সংরক্ষণ করবে মানবতাবাদের বিকাশ সাধনের সকল সহায়ক উপাদান ও শক্তিগুলোকে।

আধুনিক শিক্ষিতদের অনেকে মনে করেন যে, সর্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে শরীয়তের বিধি-বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা সহজসাধ্য নয়। মূলত নেতিবাচক মন-মানসিকতার কারণে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া হয়। নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে নেতিবাচক মানসিকতার জন্ম হয়েছে। মানব প্রকৃতি ও এর সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখার ফলে মানব-উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে

www.amarboi.org

এরা এড়িয়ে যান। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলা কঠিন এ বক্তব্য তাদের নিকট থেকেই আসে যারা তা মেনে চলতে কখনো চেষ্টা করেননি।

ইসলামকে বলা হয় ফিতরাত বা স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা। মানুষের প্রকৃতি ইসলামী শরীয়তের অন্তর্নিহিত বিষয়। মানব-মনের গভীরে মানবাত্মার জাগৃতির ফলেই মানুষ বিশ্বাসী হয়। আত্মিক এ জাগৃতি মানুষকে অদৃশ্য মহান শক্তির নিকট নিজেকে সমর্পিত করার জন্য প্রেরণা দেয়। এ শক্তিই বিশ্বাসীকে উদ্বুদ্ধ করে ন্যায় ও সত্য পথের পথিক হবার জন্য। ফলে প্রকৃত বিশ্বাসীদের নৈতিক শক্তি এতো প্রবল হয় যে, পার্থিব কোনো শক্তির নিকট তারা মাথানত করেন না। বিশ্বাসীদের নৈতিক বল অবিশ্বাসীদের নিকট ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবিশ্বাসীরা নীতি-নৈতিকতাকে মনে করে এক কঠিন শিকল। ফলে তারা ধর্মের অনুশাসনকে মনে করে ভীতিপ্রদ।

অবিশ্বাসীরা দেখে যে, মানবীয় কামনা-বাসনার বিপরীতে নীতি-নৈতিকতা এক বিরাট বাধা। কিন্তু বিশ্বাসীরা মনে করেন মানব জীবনের গঠনমূলক ও ইতিবাচক বিকাশ সাধনের জন্য নৈতিকতা একটি প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তি। এ শক্তি মানুষকে গতিশীল, কর্মমুখর ও প্রাণবন্ত জীবনের অধিকারী করতে পারে। "ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ", বিশ্বাসীদের জন্য এক সার্বক্ষণিক সংগ্রাম। নিরন্তর এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে থাকে। আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান না হলে প্রত্যয়বাদী মানুষের পক্ষে নিরন্তর সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

পার্থিব লোভ-লালসা থেকে আত্মসংযম অবলম্বন করা অবিশ্বাসীদের নিকট নৈতিক বন্ধন। কিন্তু বিশ্বাসী মানুষ মনে করেন আত্মসংযম, প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্তি এবং মানবীয় ইচ্ছা শক্তির উন্নয়ন। ইসলামী শরীয়ত মানুষের স্বাধীনতায় যে সীমা নির্ধারণ করেছে তা মানব উন্নয়নের মহান লক্ষকে সামনে রেখে। এ সীমারেখা অতিক্রম করা হলে মানব-মর্যাদা, শালীনতা ব্যাহত হয়। মানব-কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বাসীরা মানবাত্মার অবমাননা করতে চান না এবং চান না মানব উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিময়তাকে রুদ্ধ করতে। আর তাই তাঁরা চান প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি। শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের ভোগের অধিকার সীমিত। নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ তাই দান করে দিতে হয়। বিশ্বাসীদের নিকট শরীয়তের এ নির্দেশ কোনো শিকল বা বোঝা নয় বরং লোভ হতে মুক্তির উপায় এবং বিবেকের জাগৃতি। বিবেকের এ জাগৃতিই মানব কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও বিশ্বমানবতা

প্রাক ইসলামী যুগে বিশ্বের কোথাও আদর্শিক ঐক্যের কোনো ধারণা ছিল না। বিভিন্ন সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিল। এক গোষ্ঠী অপরকে হীন বা নীচ মনে করতো। সমাজে এমন কোনো আদর্শ ছিল না যা আপামর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পারে। মানুষে মানুষে ঐক্য সৃষ্টিকারী একটি মহৎ আদর্শের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। মানবতার এ চরম দুঃসময়ে নবী মুহাম্মদ স. বিশ্বমানবের জন্য চির কল্যাণের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন। বিশ্বমানবের মুক্তি সনদ রূপে তিনি মানুষের নিকট পেশ করলেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। পবিত্র কুরআনের ছায়াতলে তিনি মানুষকে একত্রিত করতে চাইলেন। প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণাকে ভেংগে দিয়ে তিনি শুরু করলেন দুর্নিবার এক সংগ্রাম যার লক্ষ হলো বিশ্বমানবতাকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা। রাসূল স.-এর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো আদর্শ এক মানব বন্ধন। ফলে তদানীন্তন দুনিয়ায় এক ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী নতুন বিপ্লবী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। মৃত-প্রায় বিশ্বমানবতার জরাজীর্ণ দেহে এক নব-জীবনের সূচনা হলো। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা। ফলে তারা সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে জেগে উঠেছিল। এ জনগোষ্ঠী ছিল বর্ণ, বংশ বা শ্রেণীর প্রভাবমুক্ত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের একান্ত অনুসারী।

কিন্তু কালের গতিধারায় আদর্শচ্যুতির সাথে সাথে এ জনগোষ্ঠীর মাঝে ভাংগন দেখা দিল। মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মের বৈসাদৃশ্য তাদেরকে ক্রমশঃ অকর্মণ্য গোষ্ঠীতে পরিণত করলো। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরাভূত হলো মুসলিম মিল্লাত। ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যের ধ্যান-ধারণা থেকে বিছিন্ন হবার ফলে মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে গেল। মুসলমান জনশক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত ও পরাভুত হলো। আদর্শ ও চিন্তার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিল। ফলে মুসলিম উম্মাহ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লো। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় আক্রান্ত মুসলমানরা উম্মাহর ঐক্যের পথে কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতেও ব্যর্থ হলো।

ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুগতরা বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়ার সব মানুষ এক জাতি। একই উৎস থেকে মানুষ এসেছে এবং এক আল্লাহর দিকে তাদের

www.amarboi.org

ফিরে যেতে হবে। বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য নয়। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের উপর সমানভাবে এসেছে তাই প্রতিটি মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতে পারে না। সব মানুষের অধিকার সমান। কারো কোনো অধিকার নেই অন্যের কোনো অধিকার খর্ব করার। শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলের মানবিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দিয়েছে ইসলামের জীবন বিধান। ইসলামের জীবনদর্শন অনুযায়ী বংশ, পরিবার, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতা মানুষকে একত্রিত করার বা বিচ্ছিন্ন করার কোনো ভিত্তি হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি মানুষের ভালবাসা নির্ধারণ করে দেয় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বাস হচ্ছে মানব ঐক্যের একটি আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধন।

আমাদেরকে অবশ্যই এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টিকারী বলিষ্ঠ এক বন্ধন। ঈমান বা বিশ্বাস ছাড়া কখনো উম্মাহর ধারণা করা যায় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(ক)

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ -

"তোমাদের উম্মত একই উম্মত অতএব আমাকেই ভয় কর। আর আমি তোমাদের রব।"—সূরা মু'মিনুন ঃ ৫২

(খ)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

(গ)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج

"এবং স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা। তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি

www.amarboi.org

করে দিয়েছেন যার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে একে অন্যের ভাই হয়ে গেলে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

(ঘ)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০

(ঙ)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ط

"যারা নিজেদের দীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৫৯

নবী মুহাম্মদ স. তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বললেন, "ইসলামে জাতি, শ্রেণীভেদ ও বর্ণ বৈষম্য নেই। আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার উপর কালো বা কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

"হে লোক সকল, শুনে রাখ, মুসলমানরা পরস্পরের ভাই।"

ইসলাম যেমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এক অখণ্ড অবিভাজ্য আদর্শ, তেমনি এর লক্ষ হচ্ছে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য সমাজ। বিশ্বাসীদের ঐক্যের মূল লক্ষ হচ্ছে একটি আদর্শ ভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সুসংঘবদ্ধ আদর্শ সমাজে পরিণত করা। বিশ্বাসীদের এ ঐক্য কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত নয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী কোনোকালেই শক্তির বলে অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসীতে পরিণত করতে চায় না এবং প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। বিশ্বাস মানুষের মনের ভেতরে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়। মনের এ গোপন প্রহরীকে বাইরের কোনো শক্তির পক্ষে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না।

বিশ্বাস একান্তভাবেই ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি ও চেতনা যা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এর ফলে একজন বিশ্বাসী স্বেচ্ছায়, সৎ ও উন্নত চরিত্রের ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে আগ্রহী হয়। বিশ্বাসের বলে মানুষ আত্ম-বিশ্বাসী, সংযমী ও ত্যাগী হতে পারে। বিশ্বাসীদের ঐক্যের ফলে তাই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে উৎকৃষ্ট জনসমাজ। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির নিকট আদর্শ মানব সমাজের একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে বিশ্বাসীদের ঐক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে শুধুমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে। বিশ্বাস ভিত্তিক ঐক্য স্থাপিত হলে জীবন ও জগত সম্পর্কে মানব মনে একটি পরিপূর্ণ ধারণার জন্মলাভ করে। কারণ বিশ্বাস নির্ধারণ করে দেয় আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মানুষ শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করবে। পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থী কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না। কারণ আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থী সকল মতবাদ মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করে।

ইসলামের লক্ষ হচ্ছে মানুষকে সব রকমের অধীনতা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগত করা। আল্লাহ ছাড়া সকল পরাধীনতা হতে মুক্ত মানুষের সমাজ কায়েম করার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসীদের ঐক্য। আর তাই ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য। বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি। মু'মিনের বিপরীত শব্দ কাফির। কাফির অর্থ গোপন করা বা ঢেকে রাখা। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা সে অস্বীকার করে এবং এসবের পক্ষে তার মনে যেসব যুক্তির উদয় হয় তা সে গোপন করে। বিবেকের দাবীকে সে অস্বীকার করে। তাই সে বিশ্বাসী নয়, কাফির।

ইসলামের মৌল ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করার অর্থ ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান। কারণ বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামের চিহ্ন বা পতাকা। যিনি তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেন তিনি মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হন। বিশ্বাসের ভিত্তিতে সকল আদম সন্তান এক জাতীয়তার সূত্রে এবং এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে জীবনকে গড়ে তুলতে পারেন।

জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী নিরূপণে বিশ্বাস সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আমরা যেসব রীতিনীতি ও আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত করতে চাই সেসব রীতিনীতি বা আইন-কানুন গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসী ও একজন অবিশ্বাসীর মানদণ্ড এক নয়। একজন বিশ্বাসীর সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনের পেছনে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জন মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকে। পার্থিব কামনা-বাসনা বা বৈষয়িক স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাসীদের জীবন পরিচালিত হয় না। এ কারণে বিশ্বাসীদের সমাজে সর্বৈব সুখ ও শান্তির পরিপূর্ণতা আসতে পারে। অন্যদিকে একজন অবিশ্বাসী সৎ ও সুন্দর জীবনের অভিলাষী হন, পার্থিব মান-মর্যাদার আকাংখা কিংবা নিছক সামাজিক নীতি-নৈতিকতার প্রতি আনুগত্যের কারণে।

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন ছাড়া বিশ্বাসীদের ঐক্য অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ মানবতার কল্যাণ ও সার্বিক মুক্তি। সকল প্রকার আধিপত্যবাদ ও নির্যাতন হতে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করার জন্য তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মিথ্যার উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং যালেমের উপর মযলুমের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রয়োজন।

বস্তুত বিশ্ব-মানবতার মুক্তির ঐকান্তিক তাকিদেই বিশ্বাস ভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কুফল ও অসারতা সম্পর্কে মানুষ আজ সম্পূর্ণ অবহিত। বস্তুবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য মানুষ আজ লালায়িত। নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধানে সমাজবিদগণ গলদঘর্ম হচ্ছেন। অবক্ষয়ের গহ্বর থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন পথ ও পন্থার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বস্তুবাদের বীজ উৎপাটন না করা হলে কোনো পন্থা বা পদ্ধতি সফলতা লাভ করতে পারবে না। বিশ্বাস বিবর্জিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎপাটন ব্যতিরেকে বিশ্ব-মানবতা সংকট মুক্ত হতে পারে না।

সংকট হতে উত্তরণের জন্য ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের সমাজে অবশ্যই সকল সম্পদের সমন্বিত সুসম ব্যবহার ও বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে। কেননা মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে শুধুমাত্র সামঞ্জস্যশীল সমাজ গঠনের সাহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং গড়ে তুলবে শোষণমুক্ত গতিশীল এক সমাজ। বিশ্বাসীদের ঐক্যের মাধ্যমেই বিশ্ব-সম্পদের সুসম ব্যবহার ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কেননা মুসলিম দেশসমূহের রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশাল জনশক্তি। বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীদের ঐক্য, সম্পদের ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এর ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সংস্কারের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিশ্বাস ঘটবে। ইসলামের জীবন বিধান ও নীতিমালার আলোকে বিশ্বাসীদের ঐক্য হলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের একটি ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিশ্বাসীদের ঐক্য ও বিশ্বাসীদের আদর্শকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। আদর্শবিহীন ঐক্যের কোনো সুফল সমাজে আসতে পারে না। ঐক্যের জন্য সর্বাগ্রে তাই প্রয়োজন পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। বস্তুত বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপরই ইসলামী সমাজ-বিপ্লবের মহান বিজয় অর্জন করা সম্ভব।

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অবশ্য কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু এ সংগ্রাম পবিত্র ও মহান। বিশ্ব-মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে অবশ্যই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য এ এক ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলমানদেরকে নিজেদের ঈমান ও আকীদার পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে। নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে প্রত্যয়দীপ্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী রূপে। তাদেরকে বেছে নিতে হবে সহজ, সরল ও সর্বোত্তম পথ তথা "সিরাতুল মুস্তাকিম"। সর্বোত্তম পথে এগুতে হবে দ্বিধাহীন ও নিশংকচিত্তে। তখনই আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যম্ভাবী রূপে নেমে আসবে।

বিজয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বিশ্বাসীদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ বিশ্বাসীরা জানেন যে, সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। দেশে দেশে পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের মুখে মুসলমানদের পরাজয়ের মূল কারণ মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক ঐক্যের অভাব। আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐক্য একান্ত কাম্য। কারণ, আদর্শহীনতা এবং অনৈক্যের কারণেই মুসলমানরা আজ পরাজিত এবং ঘৃণিত। স্বীয় আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত না হলে এবং ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপিত করা সম্ভব না হলে বর্তমান অবস্থা হতে উত্তরণের বিকল্প কোনো পথ আছে বলে মনে হয় না।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শিক ঐক্যের অভাব তাদেরকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। যাদের দায়িত্ব ছিল সমগ্র বিশ্ব-মানবতাকে এক ঐক্যবদ্ধ আদর্শ সমাজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা তারা নিজেরাই আজ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার। প্রতিনিয়ত মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে অপমানিত হচ্ছে। নানা ছুতায়, নানা অজুহাতে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে মানবতার শত্রুরূপে। মুসলমানরা অভিযুক্ত হচ্ছে সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ঐক্য যাদের জীবনের ব্রত তাদের উপরে আরোপিত হচ্ছে জঘন্যতম অপরাধের দায়-দায়িত্ব।

কে বা কারা, কোন্ উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে এভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে তা ক্রমশঃ সবার নিকট পরিষ্কার হলেও মুসলমানদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, একটি মহোত্তম আদর্শের বাস্তবায়নে তাদের নিজে দের যে ভূমিকা রাখা উচিত ছিল তা পালনে তাদের ব্যর্থতার ফলেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাস ভিত্তিক সমাজ এবং বিশ্বাস ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে একযোগে অনবরত কাজ করার শপথ গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে পারি।

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও বাস্তবতা

ইসলাম ধর্মের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস। মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহর একত্বে, ফেরেশতাদের অস্তিত্বে, কুরআনের সত্যতায়, হযরত মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়াতে ও পরকাল বা আখিরাতে বিশ্বাসস্থাপন অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বাসস্থাপন শুধু মৌখিক উচ্চারণ বা স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ের বিষয়। বিশ্বাসের গভীরতা মানুষের আচার- আচরণ ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডে প্রকাশ হয়। মুসলমানদের সমাজে যখন আমরা অনাচার, অবিচার, অন্যায় প্রভৃতি দেখি তখন স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায় যে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের সংখ্যা সেই সমাজে অতি নগণ্য অথবা বিশ্বাসের গভীরতা সে সমাজের সদস্যদের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ বা দুর্বল।

একজন বিশ্বাসী মুসলমান যখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই) এ বক্তব্যে বিশ্বাস করেন তখন তিনি স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়ানো যাবে না। আল্লাহ সকল সৃষ্টির একমাত্র প্রভু, সৃষ্টিকর্তা ও আদেশ দাতা। একইভাবে পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর বাণী ও ফরমান হিসেবে মেনে নেয়ার সাথে সাথে এ স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, কুরআনের সকল বক্তব্য সত্য ও সঠিক। অতএব, কুরআনের সকল নির্দেশ মেনে চলা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ বা কর্তব্য।

বিশ্বাসী মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মদ স.-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীরূপে স্বীকৃতি দেন। এ স্বীকৃতির অর্থ, নবী মুহাম্মদ স.-এর সকল আদেশ-নির্দেশ, আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ-এর অনুসৃতি মাত্র। অতএব বিশ্বাসী মুসলমানরা নবী মুহাম্মদ স.-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। যদি মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশে কোনো ত্রুটি থাকে, যদি কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা ও দুর্বলতার জন্ম নেয়, সে ক্ষেত্রে মুসলমানরা নিজেদেরকে প্রকৃত বিশ্বাসী বলে দাবী করলে তা হাস্যকর ও অবাস্তব বলে মনে হয়। আমাদের সমাজে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কতটা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মনে করে নিজেদের জীবনাচরণে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ কতটা মেনে চলছি সে প্রশ্নের জবাব প্রত্যেকে নিজের নিকট করলেই পেয়ে যাব।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতবার মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি, পরনিন্দায় লিপ্ত থাকছি, সত্য, ন্যায়, সত্যতা ও পবিত্রতার পথে কয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করছি

www.amarboi.org

তা আমরা বিবেককে প্রশ্ন করলে জানতে পারবো। এ প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতেই আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয় বুঝতে সক্ষম হবো যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি কতটা বিশ্বাসী বা আমার বিশ্বাসের ভিত্তি কতটা দুর্বল বা সবল। দৈনন্দিন জীবনে সমাজের মানুষের সাথে আমাদের মেলামেশা, লেনদেন ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে আমরা নিজেদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ, সুনাম-খ্যাতি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছি না আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে মূল লক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছি? এ প্রশ্নের জবাব যদি আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের নিকট জানতে চাই তাহলে আমাদের বিশ্বাসের গভীরতা যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। কারণ, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা ও প্রতিটি পদক্ষেপ ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে একজন বিশ্বাসীর সকল সৎ চিন্তা ও কর্ম ইবাদাত। প্রকৃত অর্থে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী নিজেকে আল্লাহর অনুগত একজন বান্দা বা দাস ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। একজন বিশ্বাসীর জীবনে ইবাদাত বা দাসত্ব ছাড়া আর কোনো কামনা-বাসনা নেই। একজন শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী, চাকুরীজীবী যে কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করেন তা আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে যদি তা করা হয় আল্লাহর ভীতি হৃদয়ে পোষণ করে পূর্ণ বিশ্বস্ততা বা ঈমানদারীর সাথে।

আমরা যদি পার্থিব জীবনের সকল কাজ আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ অনুসারে করতে পারি এবং অপরের অধিকার হরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি তাহলে আমাদের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি আচরণ ইবাদাত হিসেবে বিবেচিত হবে। হালাল জীবিকা অর্জন ও হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকার জন্য জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে বিশ্বাসীদের যে সংগ্রাম তা তাদের ইবাদাত বলে বিবেচিত।

বস্তুত মানুষকে পূত-পবিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার লক্ষেই ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম। এ লক্ষ অর্জনের জন্য ইসলামে কয়েকটি ইবাদাতকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যরূপে পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি মুহূর্তে, হৃদয়ে আল্লাহরভীতি পোষণ করে তাঁর প্রদত্ত ও নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করার জন্য নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধান দেয়া হয়েছে। এ চারটি ইবাদাত ইসলাম ধর্মের খুঁটি বা স্তম্ভ। ঈমান বা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর চারটি স্তম্ভকে মজবুতভাবে দাঁড় করাতে মানুষ সক্ষম হলে ক্রমান্বয়ে সে ইসলাম নামক জীবনাদর্শের রূপকার হতে পারে।

www.amarboi.org

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজকে ইবাদাতে পরিণত করা বিশ্বাসীদের মূল লক্ষ। এ লক্ষ অর্জনের জন্যই আল্লাহ্ বিশেষ চারটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার তালীম নিতে বলেছেন। বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রশিক্ষণে যিনি যতোবেশী সফলতা দেখাতে পারবেন তিনি ততোবেশী চরিত্রবান রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

নামাযকে ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ বলা হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ইসলামের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আকুতি ও অঙ্গীকার করা হয় নামাযের মাধ্যমে। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা হয় যে, বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি আল্লাহকে ভয় করে চলবেন এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেকে নামায পড়েন কিন্তু সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, মুনাফেকি, চাটুকারিতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত নন। ব্যক্তি জীবনে সাধারণ মুসলিম চরিত্রের এ বৈপরীত্যের ফলে ব্যক্তি-চরিত্রের কাংখিত মান অর্জিত হয় না ফলে সমাজ জীবন থেকে অন্যায়, অবিচার, অনাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

একজন বিশ্বাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা ও উদাসীনতার ফলে সমাজ জীবনের এ দুঃখজনক বাস্তবতার মাঝে আমরা নির্বিকারভাবে কালাতিপাত করছি। ঈমানের সাথে আমলের (বিশ্বাসের সাথে কর্মের) সম্পর্কহীনতার কারণে আমাদের বিশ্বাস দুর্বল বিশ্বাসে বা তথাকথিত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। একদিকে জুমআর নামাযে যেমন স্থান সংকুলান হয় না বলে আমরা দেখতে পাই, অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্ত্রাস, হত্যা, রাহাজানি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যের সাথে ফলাফলের এ বিপরীতমুখী প্রবণতার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, ইবাদাতসমূহ নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। যন্ত্রের মত অঙ্গ-পরিচালনা ও মন্ত্রের মতো উচ্চারণের দ্বারা বাস্তবে কোনো ফায়দা হাসিল হয় না।

আমরা জানি যে, সওম সাধনা বা রমযানের রোযা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোযার দ্বারা আমরা দৈহিক উপবাস ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হই না। এ প্রসংগে নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন ঃ

ক. "এমন অনেক রোযাদার আছে যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভোগ করা ছাড়া তাদের নেকীর পাল্লায় আর কিছুই পড়ে না।"–মিশকাত

খ. "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত হলো না তার ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্ত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন ছিল না।"–বুখারী

www.amarboi.org

বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য তৃতীয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে যাকাত। যাকাত একটি আর্থিক ইবাদাত। যাকাত না দিলে ধন-সম্পদ পবিত্র হয় না। এজন্য এ ইবাদাতকে পবিত্রতাকারী আমল বলা হয়। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ বিত্তশালীদের সম্পদে বিত্তহীনদের অধিকার ও অংশ নির্ধারণ করেছেন। ঐ নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা বিশ্বাসীর হৃদয়ে পার্থিব ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে সমাজ থেকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হয়।

পবিত্র কুরআনে বিরাশি স্থানে যাকাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসের পরেই নামায ও যাকাতের গুরুত্ব। নামায ও যাকাতকে ইসলামের পরিচায়ক এবং ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশের সাক্ষ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম পরিহাস এই যে, মুসলমান বিত্তশালীরা সমাজের বিত্তহীনদেরকে তাদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অন্যদিকে সমাজ জীবনে প্রকৃত বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব না থাকার ফলে বিত্তহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মুসলমানদের সমাজে গড়ে উঠছে পুঁজিপতি, অত্যাচারী ও কালোবাজারী। অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে কেউ, আর কেউ থাকছে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অধিকারহীন, উপেক্ষিত ও অপমানিত। দু' মুঠো অন্নের জন্য মানুষের হাহাকারের পাশাপাশি অঢেল সম্পদের অপচয় আমরা দেখতে পাই।

আল্লাহর নির্দেশের প্রতি কি পরিমান উদাসীন ও গাফেল থাকলে মুসলমানদের সমাজে এ ধরনের চরম অপমানকর অবস্থা বিরাজ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য এ পরিস্থিতি মর্মান্তিক মর্মজ্বালার কারণ। কিন্তু যাকাত ব্যবস্থাকে সামাজিকভাবে প্রয়োগ ও কার্যকরী না করার ফলে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজব্যবস্থার সুস্থ বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাসীরা হেদায়াত বা সুপথ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"হেদায়াত ঐসব মুত্তাকীদের জন্য যারা গায়েবের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং যা আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩

www.amarboi.org

(খ)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط

খ. "যারা নামায কায়েম করে, আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৩-৪

বিত্তশালী বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্যরূপে যাকাত-এর পাশাপাশি নির্ধারিত হয়েছে হজ্জ। হজ্জ অর্থ, যিয়ারতের এরাদা। বিশ্বাসীদের জন্য হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত। এ ইবাদাতে সম্পদ ব্যয় করতে হয়, দেহকে শ্রম দিতে হয় এবং মনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হয়। হজ্জের মাধ্যমে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী নবজাতকের মতো পবিত্র হন। হজ্জ, বিশ্বাসীদের জন্য একটি মানদণ্ড। এ মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয় যে, হজ্জের তওফিক লাভের পরেও মানুষ এর থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে কিনা। হজ্জ নিছক ভ্রমণ বা সফর নয়।

একজন বিশ্বাসী হজ্জযাত্রীর মন নিবদ্ধ থাকে শুধু আল্লাহর দিকে। তাঁর অন্তরে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। অতীত দুষ্কৃতির জন্য তিনি লজ্জিত হন এবং ভবিষ্যতের জন্য তিনি কামনা করেন শুধুমাত্র আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য। এছাড়া হজ্জ বিশ্ব মুসলমানের এক মহাসম্মেলন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিশ্বাসীদের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য হজ্জ নিসন্দেহে একটি আদর্শব্যবস্থা। আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে হজ্জের লক্ষ ও আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এভাবে মুসলমান সমাজের বিশ্বাস, জীবনাচরণ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা অনেকেই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে মনে করে থাকি। আমাদের মধ্যে ধর্ম ও কর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলেই আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছি। ইসলাম ধর্মে অদৃশ্যে বিশ্বাস শুধুমাত্র একটি দার্শনিক তত্ত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং এ স্বীকৃতির কারণে বিশ্বাসীর নিকট দাবী করা হয় এমন একটি আদর্শ চরিত্র যার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে বাস্তব জীবনের প্রতিটি আচরণে। ঈমানের ভিত্তি যতো গভীর ও দৃঢ় হবে ততোবেশী করে আমরা আমাদের আচরণে এমনি এক আদর্শ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম

www.amarboi.org

হবো এবং তখনই আমাদের আমল প্রকৃত বিশ্বাসীর আমল বলে গণ্য হবে। আমাদের পক্ষে খুব সহজেই প্রকৃত বিশ্বাসীরূপে নিজেদেরকে গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে যদি আমরা এ ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মদ স.-এর নির্দেশিকা অনুসরণে নিজেদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারাকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হই।

প্রকৃত বিশ্বাসী কে ? বিশ্বাসের সাথে চরিত্রের এবং কর্মের সম্পর্ক কি ? বিশ্বাসী মুসলমানদের করণীয় কি হওয়া উচিত ? এসব প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি মহানবী স.-এর হাদীস থেকে যেমন ঃ

১. "যদি পুণ্যকাজে তোমার আত্মতৃপ্তি এবং পাপ কাজে অনুশোচনা হয় তবে তুমি একজন মুমিন।"

২. "মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা কারো জীবন ও সম্পদের আশংকা হয় না।"

৩. "তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে ব্যক্তি আপন আপন পরিবারবর্গের সাথে সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করে।"

৪. "যার মধ্যে বিশ্বস্ততা নেই, তার বিশ্বাস নেই এবং যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভংগ করে, সে ধর্মহীন।"

৫. "ধৈর্যশীলতা এবং উদারতার নাম বিশ্বাস বা ঈমান।"

৬. "শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা বিশ্বাসের অর্ধেক।"

৭. "বিশ্বাসের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই যে, তুমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে তোমার উপাস্য হিসেবে স্বীকার করবে না। বিশ্বাসের সর্বনিম্ন শাখা এই যে, রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো কাঁটা পথিকের কষ্টের কারণ হতে পারে দেখে তুমি তা সরিয়ে ফেলবে। লজ্জাশীলতাও বিশ্বাসের একটি শাখা।"

৮. "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তার উচিত অতিথির সম্মান করা এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। হয় সে উত্তম কথা বলবে নইলে মৌনতা অবলম্বন করবে।"

৯. "প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো বিদ্রূপকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী এবং প্রগলভ হতে পারে না।"

১০. "ঐ ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী নয় যার কারণে তার প্রতিবেশী শান্তিতে থাকতে পারে না।"

www.amarboi.org

১১. "যদি কেউ পরিতৃপ্তির সাথে ভোজন করে এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, তবে সে ঈমানদার হতে পারে না।"

১২. "প্রতারক, কৃপণ এবং উপকার করে তার প্রচারকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

১৩. "হারাম খাবারের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

১৪. "যদি কোনো নারী, পুরুষ ষাট বছর ইবাদাত করার পর মৃত্যুকালে কোনো অছিয়ত দ্বারা অপরের অধিকার নষ্ট করে তাহলে তার জন্য জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী হবে।"

১৫. "যে ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধির জন্য পণ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখে সে অভিশপ্ত।"

১৬. "মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ তার পণ্যদ্রব্য চল্লিশদিন গুদামজাত করে রাখে, তবে আল্লাহর সাথে তার এবং তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। চল্লিশ দিন পণ্যদ্রব্য আবদ্ধ রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু তার এ অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।"

১৭. "যে ব্যক্তি তার অধীন কর্মচারীদের প্রতি মন্দ আচরণের সাথে কর্তৃত্ব করে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

সর্বশেষ, কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকনির্দেশিকা যা চলার পথের "গাইড" হিসেবে গ্রহণ করা হলে সুফল পাওয়া যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ যাঁরা পেতে চান তাঁরা রাসূল স.-এর নির্দেশাবলী অনুসারে নিজেদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। অতএব বাস্তবতার নিরিখে নিম্নের উপদেশ-নির্দেশ অনুসারে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। নবী স.-এর উপদেশাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক. সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে জাগ্রত রেখো, তাহলে তুমি সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে।

খ. অল্প প্রাপ্তিতে তুষ্ট থাকতে শেখো, তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা ধনী হতে পারবে ;

গ. অপরের জন্য তুমি তাই পসন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য পসন্দ করো, তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান হতে পারবে ;

www.amarboi.org

ঘ. মানুষের জন্য উপকারীরূপে নিজেকে গড়ে তোল, তাহলে তুমি উত্তম মানুষরূপে পরিগণিত হতে পারবে ;

ঙ. তোমার কোনো অভাব-অভিযোগ মানুষের নিকট উত্থাপন করো না, তাহলে তুমি সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হতে পারবে ;

চ. সবসময় পাক-সাফ থাকতে সচেষ্ট থাকবে, তাহলে আল্লাহ্ তোমার রিযিক সুপ্রশস্ত করে দেবেন ;

ছ. আল্লাহর যিকির বেশী করে করবে তাহলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে ;

জ. এমনভাবে ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, যদি এটুকু না পার তবে মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করবে যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ দেখছেন ;

ঝ. প্রতিটি ফরয নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, তাহলে আল্লাহর অনুগত বান্দার স্তরে উন্নীত হতে পারবে ;

ঞ. অত্যন্ত যত্নের সাথে ফরয গোসল সমাধা করবে, তাহলে আল্লাহর নিকট পবিত্র অবস্থায় যাওয়ার তাওফীক লাভ করবে ;

ট. কারো প্রতি অত্যাচার করো না তাহলে হাশরের ময়দানে আলোময় পরিবেশে উঠবার সৌভাগ্য হবে ;

ঠ. নিজের উপর এবং আল্লাহর বান্দার উপর দয়া করো, তাহলে আল্লাহ্ হাশরে তোমার উপর রহম করবেন ;

ড. বেশী করে ইসতেগফার পড়, তাহলে আল্লাহ্ তোমার পাপ মার্জনা করবেন ;

ঢ. আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল স. যা পসন্দ করেন তাই পসন্দ করো, তাহলে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রিয় হতে পারবে ;

ণ. আল্লাহর কোনো সৃষ্টির উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না, তাহলে হাশরে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে ;

ত. হারাম খাবার থেকে বিরত থাকবে, তাহলে আল্লাহ্ তোমার দোয়া কবুল করবেন ;

থ. তোমার ভাইদের ত্রুটি গোপন রাখতে চেষ্টা করবে, তাহলে আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে তোমার ত্রুটি ঢেকে রাখবেন ;

দ. মনে রেখ, তোমার অনুশোচনার অশ্রু, বিনয় ও রোগ-বালাই তোমাকে পাপ থেকে মুক্ত ও দোষত্রুটি থেকে পবিত্র রাখতে পারবে ;

www.amarboi.org

ধ. মনে রেখ, সৎ চরিত্র, বিনয়, নম্রতা ও বিপদে ধৈর্যশীলতা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় সৎকাজ বলে বি.বেচিত ;

ন. মনে রেখ, দুশ্চরিত্রতা, লোভ-লালসা ও অন্যকে কিছু দিয়ে তার উপর অনুগ্রহ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় পাপ বলে বিবেচিত ;

প. তোমার গোপন দান ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাকে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করবে ;

ফ. সব ধরনের বালা-মুসীবতে ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তা জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করতে পারবে ;

ব. উত্তম চরিত্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হও, তাহলে ঈমানে পূর্ণতা আসবে।"

নবী মুহাম্মদ স.-এর যে কয়টি বাণী উপরে বর্ণিত হলো তা থেকে আমরা নিশ্চয় বুঝতে সক্ষম যে, বিশ্বাসীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও কর্মকাণ্ড কোন্ ধরনের হওয়া প্রয়োজন। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে কিংবা নিজেকে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিলে কিংবা শুধুমাত্র ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালন করলে প্রকৃত বিশ্বাসীর চরিত্র আমরা পেতে পারি না। বিশ্বাস আনার সাথে সাথে প্রকৃত বিশ্বাসীকে তার মন-মগজ থেকে অবশ্যই ইসলাম বিরোধী সকল বিশ্বাস, মতবাদ, দর্শন ও চিন্তাধারাকে বর্জন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের আনুগত্য করো না। (কারণ) সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮

ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জীবন এক ও অবিভাজ্য। অতএব জীবনের কোনো কোনো দিক ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী আর কোনো কোনো দিক আমরা ইসলাম বিরোধী নীতি বা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করতে চাই, তবে আমরা নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলমানরূপে দাবি করতে পারি না। কেননা জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ বা আদর্শের অনুসরণ করা হবে; তা হবে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর।

www.amarboi.org

যদি মসজিদ ও জায়নামাযের গণ্ডীর বাইরে আমরা ইসলামী জীবনাদর্শের বিপরীত চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী আমাদের কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করি তাহ্‌লে তা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসীর চরিত্র হতে পারে না। যে সমাজের মানুষ ও তার পরিবেশ ইসলামের বিপরীত জীবনাদর্শ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিচালিত সে সমাজ স্বাভাবিকভাবে নিমজ্জিত থাকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও যাবতীয় অনাচার ব্যভিচারের মধ্যে। একই সাথে ইসলামী আদর্শ বিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ নূতন প্রজন্মকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করে চলেছে। ফলে তারা আজ ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া, প্রগতি বিরোধী, পুরাতন, জীর্ণ এবং অচল ধ্যান-ধারণা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। দীর্ঘদিনের গোলামীর পর বিভিন্ন মুসলিম দেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও এসব দেশের আধুনিক শিক্ষিত ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতা আজো জড়বাদী ও বস্তুবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। আল্লাহ এবং তাঁর আদর্শের আনুগত্যের পরিবর্তে মুসলমানরা তাদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র, সরকার বা শক্তির নিকট সমর্পণ করেছে নিজেদেরকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য ও মোহময়তায় মুসলমানরা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি আজ ইসলামের বিরুদ্ধে সার্বিক নেতৃত্ব ও মদদ দিচ্ছে। ফলে অনেক মুসলমান নামধারীই মুসলমানদের হত্যা করে চলেছে। প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের নব প্রজন্মকে ইসলাম বিরোধী শাসক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি অঙ্গনে অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অথচ এরপরেও সমাজের তথাকথিত এলিট শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ নিরাপদ দূরত্বে, আপন ভুবনে নির্বিকারভাবে কালাতিপাত করছে। অন্যায়ের সাথে সহ-অবস্থানের এবং বিবেকের সাথে প্রতারণার অদ্ভূত প্রতিযোগিতায় আজ আমরা মশগুল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব সন্তানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ "ইসলাম" নামক জীবনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু আমরা সেই শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছি। বিশ্বাসীদের সমাজ আজ তাই বিশ্বাসঘাতকের সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের জন্য অর্থাৎ তথাকথিত মুসলমানদের জন্য এটিই হচ্ছে জীবনের নির্মম চরম বাস্তবতা। বাস্তবতার নিরিখে তাই আজ প্রয়োজন বিশ্বাসের ভিত্তিকে ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় করা। বিশ্বাসভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের ও বিশ্বমানবতার মুক্তি।

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও নৈতিকতা

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে। প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যার সে প্রতিনিধি তার আনুগত্য করা, তার দেয়া আইন-কানুন মেনে চলা এবং বিধি-নিষেধ-এর সীমালংঘন না করা। প্রতিনিধি কখনো এমন স্বাধীনতা ভোগ করে না যে, সে নিজের খেয়ালখুশীমত সবকিছু করতে পারে এবং তার কাজের কোনো জবাবদিহিতা থাকবে না। বিশ্বাসীরা মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে তার সকল কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করবে ও তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান মেনে চলবে এটি সৃষ্টিকর্তার কাম্য।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হবার কারণে তার মর্যাদা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সবকিছুর উপর রয়েছে মানুষের কর্তৃত্ব। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুর উপর মানুষের মালিকানা নেই। সবকিছুর (মানুষসহ সকল সৃষ্টির) মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই শাসক এবং সবকিছুর নিয়ামক। মানুষ যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তখন সে হয় বিভ্রান্ত এবং খোদাদ্রোহী। প্রতিনিধিত্বের এ ধারণা মানুষকে তার জীবনের লক্ষ নির্ধারণ করে দেয় এবং লক্ষ অর্জনের জন্য তাকে সকল প্রচেষ্টা চালাতে সাহায্য করে। একজন প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের জীবনের লক্ষ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি ইত্যাদি মানুষের জীবনের লক্ষ হতে পারে না। মানুষের মূল লক্ষ হচ্ছে সকল কর্মকাণ্ডে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করা যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষের জীবনের লক্ষ যেমন আল্লাহর সন্তোষ লাভ, তেমনি সামগ্রিকভাবে মানবজাতির লক্ষ এটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও জাতির লক্ষ যদি হয় এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তখন স্বাভাবিকভাবে লক্ষের একমুখীনতার কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনায়, ইচ্ছা ও মননে, কর্মকাণ্ড ও আচরণে একমুখীনতার জন্ম নিবে। মানুষের লক্ষ ও উদ্দেশ্যের এ একমুখীনতার ফলে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি,

www.amarboi.org

বিদ্বেষ, আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে সৃষ্টি হবে সাহায্য-সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভৌগলিক সীমারেখার সকল প্রাচীর নিশ্চিহ্ন করে এক মহান মানব-সংগঠন কায়েমের লক্ষে মানব জীবনের একমুখীনতা একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং পার্থিব জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ইসলাম মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মানুষের জীবনের লক্ষরূপে নির্ধারিত হয়েছে। এ লক্ষ নির্ধারণ করার পর জীবনযাপনের জন্য একটি পদ্ধতি ও পন্থা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। জীবনযাপনের যে পন্থা ও পদ্ধতি ইসলাম নির্ধারণ করেছে তাকে বলা হয়েছে দীন (জীবনযাপন পদ্ধতি)। দীনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় মানুষের পরিচয়। আল্লাহর নির্ধারিত জীবনযাপন পদ্ধতি যারা অনুসরণ করবেন তাঁরা আনুগত্যকারী বা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসেবে পরিচিত। যাঁরা আত্মসমর্পণকারী তাঁরাই বিশ্বাসী। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকে যারা জীবনের লক্ষ হিসেবে বিশ্বাস করে না তারা আল্লাহর আনুগত্যকারী বা আত্মসমপর্ণকারী নয় এবং অবশ্যই তারা অবিশ্বাসী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাস বা ঈমান নির্ধারণ করে দেয় ঃ

ক. মানুষ পৃথিবীতে কি হিসেবে জন্মলাভ করেছে এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি হওয়া উচিত।

খ. মানুষের জীবনের লক্ষ কি এবং

গ. এ লক্ষ অর্জনের জন্য মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি কি ধরনের হওয়া উচিত।

বাস্তবিক অর্থে ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ভিত্তি। বিশ্বাসীদের নিকট ইসলামের দাবি এই যে, বিশ্বাসস্থাপনের সাথে সাথে সে ইসলামের সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক বিধান মেনে চলবে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাস হচ্ছে কর্মের ভিত্তিমূল। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সৎকাজ করা হয় ইসলাম সে কাজকে পুণ্য বলে নির্ধারণ করেছে। বিশ্বাসহীন সৎকাজ ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন ও নিষ্ফল।

বিশ্বাসের সাথে সৎকাজের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও প্রত্যক্ষ। মানুষ যদি সৎকাজকে শুধুমাত্র সৎকাজ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে না পায় তাহলে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় যা সৎ বলে বিবেচিত হবে শুধু সে তাই করবে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-

www.amarboi.org

বিধানে ন্যায়-অন্যায়, সৎ, অসৎ, হারাম-হালাল-এর যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো সে অগ্রাহ্য করবে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে পাপ-পুণ্যের বা ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা টেনে দেবে। ফলে সার্বিক মানব কল্যাণের ধ্যান-ধারণা মানুষের হৃদয়ে স্থান পাবে না।

আমাদের সমাজে কিছু কিছু নীতিবাগীশরাও নানা রকম দুনীর্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। দুনীর্তিকে "জরুরী প্রয়োজনে" বা "আপেক্ষিক বিচারে" যুক্তিযুক্তরূপে তুলে ধরে অপরের অধিকার হরণ ও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার মন-মানসিকতা এসব জ্ঞানপাপীদের মধ্যেই দেখা দেয়। বিশ্বাসহীন সৎকর্মের স্বপক্ষে যারা কথা বলে তারা মূলত মানব সমাজের চিরন্তন মূল্যবোধগুলোকে সময়ের প্রয়োজনে বদলে দেবার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। এভাবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে থাকলে মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণের পরিবর্তে স্বার্থভিত্তিক দলাদলি, হানাহানি ও সংঘাত সৃষ্টি হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ কারণেই আজ অশুভ শক্তির এতো দাপট ও প্রতিপত্তি। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ আজ সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে গ্রাস করে চলেছে। শুভবুদ্ধির স্বার্থে কখনোই শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয় না। সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থেই রচিত হয়েছে বিভিন্ন বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ এবং নিষ্পেষিত হয়েছে মানবতা। বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের নিষ্পেষণে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধারণা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। মানুষকে তাই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্ প্রদত্ত "দীনকে" মেনে নিতে হবে।

ইসলামের বিধি-বিধান বা "শরীয়ত"কে বিশ্বাসীরা গ্রহণ করেন এক সার্বজনীন নৈতিক বিধানের ভিত্তি হিসেবে। শরীয়তভিত্তিক সৎকাজের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সার্বিক মানবকল্যাণ। সৎকর্মের মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাসীরা তাই আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে গ্রহণ করেছেন কারণ শুধুমাত্র এ মানদণ্ডের ভিত্তিতেই মানুষ নিজেকে বৈষয়িক স্বার্থপরতামূলক পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়। এ মানদণ্ডের আলোকে মানুষ যখন সৎকাজ করে তখন নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সামাজিক সুনাম, সুখ্যাতি হলে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। পার্থিব লাভ-ক্ষতিকে গ্রাহ্য না করে নিঃস্বার্থভাবে সৎকর্ম করার জন্য মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য। বিশ্বাস এভাবেই জন্ম দেয় সর্বোচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বাসীদের নৈতিকতার পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বাসীগণ ক্রমান্বয়ে "তাকওয়া" ও "ইহ্সানের"

www.amarboi.org

স্তরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন। তাকওয়া হচ্ছে মানুষের মনের এমন একটি অবস্থা যার সৃষ্টি হয় পরম আল্লাহভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতি থেকে। বিশ্বাসীদের মনে যখন এ অনুভূতি জাগরুক থাকে তখন তাঁর চিন্তা-চেতনায় যাচাই-বাছাইয়ের প্রবণতা তীব্রতা লাভ করে। প্রতিটি কাজ ও চিন্তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা যাচাই করেই বিশ্বাসীগণ কর্মময় জীবনে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কর্তব্যজ্ঞান তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পরিপূর্ণ আনুগত্যের সংগে পালন করতে বাধ্য করে। যেখানেই শরীয়তের সীমারেখা লংঘিত হবার আশংকা থাকে, সেখানে তার পদচারণা বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার তীব্র অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। তিনি তখন মুত্তাকীতে পরিণত হন। প্রকৃত তাকওয়া যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়, তার সমগ্র জীবন সামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক পূর্ণতার সাথে ও সামগ্রিকভাবে ইসলামের আদর্শে রূপান্তরিত হতে থাকে। এ ধরনের তাকওয়া অর্জনের জন্য বিশ্বাসীকে অসীম ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ সময়ের সাধনার পথ পরিভ্রমণ করতে হয়।

বিশ্বাসীরা যখন নিজেদের সকল কর্মকাণ্ডকে খোদাভীতি ও দায়িত্বানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন তখন তাদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা তাদেরকে উন্নীত করে আরো উচ্চ ও মহান এক স্তরে। 'মুত্তাকী' থেকে তিনি রূপান্তরিত হন "মুহসিন"-এর মর্যাদায়। এ স্তরে পৌঁছার পর ইসলামের সাথে বিশ্বাসীর এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের সৃষ্টি হয়। তিনি তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আত্মোৎসর্গীকৃত এক সৈনিকরূপে। তখন তার হৃদয়ে জন্ম নেয় আল্লাহর প্রতি অনাবিল প্রেম।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বিশ্বাসীকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য পাগলপারা করে তোলে। ইহ্সানের এ স্তরে যেসব বিশ্বাসী পৌঁছাতে পারেন তারাই হতে পারেন ইসলামের সর্বোচ্চ ধাপের সৈনিক ও সেবক। পৃথিবীর বুকে ইসলামের বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজন মুত্তাকী ও মুহসিন মর্যাদাপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও বেশ-ভূষায় যাদেরকে আমরা ইসলামের পাবন্দ বলে মনে করি তাদের ক্ষেত্রেও তাকওয়া ও ইহ্সানের অভাব থাকতে পারে। বিশ্বাসীর হৃদয় যদি সার্বিকভাবে দীন ও শরীয়তকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট না হয় তাহলে বিশ্বাসের গভীরতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

বর্তমানে মুসলমানদের সমাজে বিশ্বাস বা ঈমান ব্যক্তির জীবনাচারণে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট নয়। অতএব কাংখিত তাকওয়া ও ইহসানের স্তরে পৌঁছা তাদের জন্য দুষ্কর। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, কঠোর সাধনা ও বলিষ্ঠ অঙ্গীকার

www.amarboi.org

ব্যতিরেকে মুত্তাকী ও মুহসিন হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে তখনই সক্ষম হয় যখন নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে সে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। বিশ্বাসীদের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকলে তারা মুত্তাকী ও মুহসিন-এর স্তরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

১. পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ। নিজেকে এবং জগতের সকল সৃষ্টিকে "আল্লাহর মালিকানা" হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. আল্লাহকে একমাত্র "আদেশ-নিষেধ" দানের অধিকারী হিসেবে মেনে নিতে হবে।

৩. আল্লাহর অবতীর্ণ জীবনবিধানকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উপেক্ষা করে অন্য কোনো মতবাদ ও মতাদর্শকে গ্রহণ করা চরম ভ্রান্তি এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে।

৪. সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় নিজেকে ও নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫. জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬. জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ স.-কে একমাত্র নেতা ও পথ-প্রদর্শকরূপে মেনে নিতে হবে।

৭. পবিত্র কুরআনের মর্মবাণীকে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য মনকে ব্যাকুল রাখতে হবে।

৮. পরকালকে ইহকালের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৯. বাস্তব কর্মজীবনে, নীতি-নৈতিকতা, স্বভাব ও আচরণের ক্ষেত্রে সময়, শক্তি ও যোগ্যতার বিনিয়োগের দ্বারা ইসলামী শরীয়তের বাস্তব প্রতিফলন ও বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

১০. নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার কথা সবসময় মনের মধ্যে জাগরূক রাখতে হবে।

বিশ্বাসীরা জানেন যে, সার্বিক মানব কল্যাণের জন্য সমাজ ব্যবস্থাপনায় সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজন। কিন্তু সমাজের নেতৃত্বে রয়েছে অসৎ ও দুর্নীতি পরায়ণ

www.amarboi.org

ব্যক্তিরা। পৃথিবীতে যাবতীয় অনাচারের মূল কারণ সম্ভবত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব। অতএব বিশ্বাসীদের নৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে নেতৃত্বের কাংখিত মান অর্জন করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় অসৎ নেতৃত্বের পরিবর্তন। নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন আনতে হলে বিশ্বাসীদের নৈতিক মান উন্নয়ন প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। অতএব, বিশ্বাসীদের উচিত সেই কাংখিত মান অর্জনের দ্বারা নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া। নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য বিশ্বাসীরা পরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন। এ লক্ষে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। একজন বিশ্বাসীকে কমপক্ষে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে হবে এবং নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে ঃ

১. নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইবাদাতের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজে যেসব কাংখিত পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়েছে সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়ার পর সেগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে।

২. ইবাদাতের মৌলিক তাৎপর্য ও মর্ম জানার পর ইবাদাতের সাথে সাথে আত্মসমালোচনার দ্বারা নিজেকে উপযোগী করতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আত্মসমালোচনার দ্বারা মানুষ ইবাদাতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। আত্মসমালোচনার আলোকে নিজেকে সংশোধন করার সচেতন প্রচেষ্টা না থাকলে ইবাদাত হয়ে পড়ে অন্তঃসারহীন ও নিষ্ফল।

৩. নিয়মিতভাবে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে এবং যেসব সাহিত্য কুরআন ও হাদীস বুঝতে সাহায্য করে তা নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রতিদিন কুরআনের বাণী ও হাদীসের মর্ম পুরোপুরি অনুধাবন করার পর বাস্তব জীবনে তা কার্যকরী করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়াস নিতে হবে।

৪. ফরয ইবাদাতের সাথে সাথে নফল ইবাদাত যেমন—নফল রোযা, নফল নামায ও সমাজ সেবামূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৫. ঘুম হতে জাগার পর থেকে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতে হবে। নবী মুহাম্মদ স.-এর উপদেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন প্রতিটি পদক্ষেপে ছোট-বড় প্রতিটি কাজে, সচেতন-ভাবে দোয়া পড়া অত্যন্ত জরুরী। এসব দোয়া বিশ্বাসীকে দুনিয়ার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক অটুট রাখে।

www.amarboi.org

এভাবে প্রতি মুহূর্তে একজন বিশ্বাসী যখন মহান আল্লাহ্‌র নিকট সৎকাজ করার শক্তি, সময় ও সুযোগ কামনা করে, নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার জীবন কল্যাণ ও ন্যায়-নিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন বিশ্বাসী ক্রমশঃ মুত্তাকী ও মুহসিনের মর্যাদায় নিজেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ইসলামের একজন আদর্শ সৈনিক রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। বিশ্বাসীদের নৈতিক মান উন্নীত না হলে তাদের পক্ষে নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অতএব সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য যারা অভিলাষী তাদের উচিত নেতৃত্ব সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে নৈতিকতার বীজ বপন করা এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে নৈতিকতার মান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

❏

www.amarboi.org

বিশ্বাসীদের গুণাবলী

একজন বিশ্বাসীকে নিজের ব্যক্তি চরিত্র গঠন করতে হয় ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার আলোকে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী একজন মুসলমান তাই জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের জ্ঞান ও অনুসরণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। হাদীসের বিষয়বস্তু হচ্ছে নবী মুহাম্মদ স.-এর বাণী, অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনো সাহাবীর বর্ণনা। হাদীস হচ্ছে নবী মুহাম্মদ স.-এর আত্ম অনুভূতি, আকাংখা বা আচরণের বিবরণ। তিনি নিজে যা করেছেন অথবা কোনো সাহাবী যা করেছেন এবং তিনি তা সমর্থন বা অসমর্থন করেছেন এ সকল বিষয় হাদীসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হাদীস বিকৃত করার বহুবিধ চেষ্টা ইসলামের প্রথম যুগে হয়েছে কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা অসাধারণ পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সত্য, নির্ভুল ও যথার্থ হাদীসগুলো বাছাই করে সংরক্ষিত ও সংকলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলিম আইনবিদগণ দুর্বল ও জাল হাদীসকে চিহ্নিত করেছেন এবং আইনের উৎস হিসেবে সেগুলোর কোনো স্বীকৃতি নেই। বর্তমান যুগে নবী মুহাম্মদ স. ছাড়া অন্য কোনো নবীর সমগ্র জীবন প্রণালী, বাণী, কার্যক্রম, আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত এমন নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত হয়নি। মুসলমানরা তাই কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী আইনের (শরীয়তের) উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে।

একজন বিশ্বাসী নিজের ব্যক্তি জীবনে কুরআন ও সুন্নাহর (রাসূলের জীবনাদর্শ) আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং তাঁর আদর্শিক বলিষ্ঠতা নির্ভর করে সেইসব গুণাবলীর উপর যা পালন করার জন্য কুরআনের ও রাসূলের নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

(ক)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ

اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

"তোমার প্রভুর শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী

www.amarboi.org

হিসেবে মেনে না নেয়। তারপর তুমি যা রায় দেবে তারা সে সম্পর্কে মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচবোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নেবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

(খ)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

"রাসূল তোমাদেরকে যাকিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যাকিছু থেকে তিনি তোমাদের বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

(গ)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط

"হে নবী ! বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

(ঘ)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج

"যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করলো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৮০

নবীর সুন্নাহ হচ্ছে মানুষের জন্য জ্ঞানের উৎস। মানুষ যদি এ জ্ঞান আহরণ ও ধারণ করে এবং তা পালন করে তাহলে সে কল্যাণের পথে চলতে পারবে। এ প্রসংগে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী বলেছেন, "আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান ও সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন তার উদাহরণ বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভালো অংশ তা চুষে নেয় এবং অনেক নতুন ও তাজা ঘাস জন্মায়। জমির আরেক অংশে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে-পানি পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ অনুর্বর যেখানে পানিও আটকায়না, ঘাসও হয় না। প্রথমটি হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ যে আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ যাকিছু দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান

www.amarboi.org

করে। আর শেষের উদাহরণটি হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায় না এবং আল্লাহর যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা সে গ্রহণ করে না।"

আল্লাহর পথে আহ্বান

একজন প্রকৃত বিশ্বাসী তাই নিজে যেমন আল্লাহর বিধান মেনে চলেন তিনি আর সব মানুষকে তা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে বিশ্বাসীদের প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর এবং রাসূলের আদেশ-নির্দেশ তথা ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলা এবং দুনিয়ার সকল মানুষ যেন এ জীবনবিধান মেনে চলে উপকৃত হতে পারে সেই প্রচেষ্টা চালানো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(ক)

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ـ

"তুমি তোমার প্রভুর দিকে ডাক দাও।"—সূরা আল কাসাস ঃ ৮৭

(খ)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"হে নবী! তুমি তোমার প্রভুর পথের দিকে ডাক, হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।"—সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

(গ)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص المائدة : ٢

"তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য করো।"

(ঘ)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ ـ

"তোমাদের ভিতর এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকতে থাকবে।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন ঃ

১. "যে ব্যক্তি কোনো ভালোর পথ দেখায় সে ঠিক ততটুকু বিনিময় পাবে যতটুকু বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পায়।"—মুসলিম

www.amarboi.org

২. "যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদ পরিবার-পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকর ব্যবহার করলো, সেও যেন জিহাদ করলো।"–বুখারী ও মুসলিম

৩. "তোমাদের কেউ পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারবে না যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে।"

–বুখারী, মুসলিম

৪. "দীন (জীবন বিধান) হচ্ছে জনগণের কল্যাণ কামনা করা।"–মুসলিম

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

জনকল্যাণ বা মানবকল্যাণ হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ। এ লক্ষ অর্জনের জন্য আল্লাহ্ দুনিয়ার মানুষের নিকট নবীর মারফত কিতাব প্রেরণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে জনকল্যাণের জন্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

(ক)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"তোমরাই সর্বোত্তম দল, তোমাদেরকে মানুষের জন্য সঠিক পথ (হেদায়াত) ও তাদের সংস্কারের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

(খ)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ط

"বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১

www.amarboi.org

হাদীসে বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন ঃ

১. "তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের দ্বারা (নসিহত)-এর মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়। অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা রন্ধ করার চেষ্টা করে বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হলো বিশ্বাসের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর।"

২. "স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"

৩. "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিশ্বাসীদের একটি মহৎ গুণ। আরবী পরিভাষায় একে বলা হয়েছে "তাওয়াক্কুল"। তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থ আস্থা স্থাপন করা বা ভরসা করা। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোনো কাজ করার সাথে সাথে তার সাফল্যের জন্য আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে নির্ভর করার নাম তাওয়াক্কুল। কাজ ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মানুষকে কাজ করার জন্য এবং চেষ্টা করে যাওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কাজের জন্যই আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং কাজ করতে গিয়ে সাফল্যের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরতা দরকার। একজন বিশ্বাসীকে নিজের যোগ্যতা, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু সাফল্যের জন্য নির্ভর করতে হবে একমাত্র আল্লাহর উপর। কারণ আল্লাহর হাতে রয়েছে সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(ক)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ -

"সেই আল্লাহর উপর নির্ভর করো যিনি চিরঞ্জীব ও অমর।"

—সূরা ফোরকান ঃ ৫৮

(খ)

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"আল্লাহর উপরই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত।"

—সূরা ইবরাহীম ঃ ১১

www.amarboi.org

(গ)

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ۔

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

(ঘ)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"
–সূরা আত তালাক ঃ ৩

বিশ্বাসীরা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আপোষহীন চেষ্টা-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করতে হবে। ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে অগ্রসর নায়করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভে সক্ষম হয়। মানুষকে এ সংগ্রাম করতে হয় একাধারে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। প্রকৃত বিশ্বাসীগণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শয়তান ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

(ক)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

"যারা আমার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে তাদেরকে আমি পথ দেখাবো। আর আল্লাহ্ নিশ্চয় সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।"
–সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯

(খ)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ۔

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাক।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯

www.amarboi.org

সত্যনিষ্ঠা

নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "সত্যনিষ্ঠা সততার পথ দেখায় আর সততা জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' (সত্যনিষ্ঠ) নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অশ্লীলতা জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মিথ্যুক নামে অভিহিত হয়।" ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠা এমন একটি গুণ যা মানুষকে কথায়, কাজে, চিন্তায় ও মননে সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখায়। ইসলাম একটি জীবনদর্শন ও জীবনবিধান। বিশ্বাসীদের কথায়, কাজে, চিন্তায়, মননে এর প্রমাণ পেশ করতে হবে। সত্য নিয়ত করা, সত্য প্রতিজ্ঞা করা, প্রতিজ্ঞা পালনে সত্যের প্রমাণ দেয়া, কাজে সত্যের অনুসরণ করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য জীবনবিধানের নমুনা পেশ করার মাধ্যমেই বিশ্বাসীরা সত্যনিষ্ঠ বা সিদ্দীক হতে পারেন। জীবনের চলার পথে সত্যনিষ্ঠার জন্য মানুষকে আন্তরিক হতে হবে এবং এজন্য সব রকমের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যারা সত্যনিষ্ঠ তাদেরকে আপোষহীনভাবে সব বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিশ্বাস, চিন্তা, কাজে ও চরিত্রে অটল, অনড় ও দৃঢ় থাকতে হয়। তাঁর জীবনের চলার পথ হতে হবে সরল কিন্তু দৃঢ়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(ক)

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

"যারা (আন্তরিকভাবে) অংগীকার করে যে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা একথার উপর অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলতে থাকে, ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, আর সেই জান্নাতের সুখবর গ্রহণ করো যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছে।"

–সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০

(খ)

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

www.amarboi.org

"যারা (আন্তরিকভাবে) অংগীকার করে যে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা একথার উপর অটল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুশ্চিন্তাও করবে না।"–সূরা আল আহ্‌কাফ ঃ ১৩

আত্ম-সংশোধন

একজন বিশ্বাসী চলার পথে সত্যনিষ্ঠ ও আপোষহীন সংগ্রামী হতে পারেন যখন তিনি নিজেই নিজের ত্রুটিসমূহ ধরতে সক্ষম হন। মানুষকে এ গুণ অর্জনের জন্য নিজের সকল কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। আত্ম-পর্যালোচনা, আত্মসমালোচনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে আত্মপর্যবেক্ষণ করে মানুষ এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাই বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

(ক)

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط

"তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন।"
–সূরা আল হাদীদ ঃ ৪

(খ)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ۝

"আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই গোপন থাকে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫

(গ)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

"আল্লাহ্ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন।"–সূরা মু'মিন ঃ ১৯

আল্লাহ্ মানুষের প্রতিটি কাজ দেখছেন মানুষের মাঝে যখন এ বিশ্বাস পূর্ণ থাকে তার পক্ষে নিজের ত্রুটি ধরা সহজ হয়। মানুষ যখন তার ত্রুটি ধরতে সক্ষম হয় তখন তাকে ত্রুটিমুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। ইসলাম ধর্মে এ প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে তাওবা করা। তাওবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে ঃ

www.amarboi.org

প্রথমতঃ তাওবাকারীকে পুনরায় কোনো অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কৃত অন্যায় কাজের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ অন্যায় কাজ পুনরায় না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

চতুর্থতঃ কৃত অন্যায় কাজ দ্বারা কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বা কারো কোনো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকে তবে তার ক্ষতিপূরণ বা অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারো প্রতি যদি কোনো অন্যায় দোষারোপ করা হয়ে থাকে তবে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(ক)

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো। তাহলে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

(খ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করো।"
–সূরা আত তাহরীম ঃ ৮

তাওবার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দীনের পথে ফিরে আসা। এজন্য মানুষকে প্রথমে আল্লাহর দীন বা জীবনবিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এরপর মানুষকে জীবনবিধান মেনে চলার জন্য অংগীকারাবদ্ধ হতে হবে এবং জীবনবিধান অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। মানুষকে চিনে নিতে হবে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য, ন্যায়ের কল্যাণকারিতা ও অন্যায়ের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে এবং ন্যায়ের পথে চলবার জন্য আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে।

নিজেকে সংশোধিত করবার ও সকল অন্যায় থেকে মুক্ত থাকার লক্ষে আন্তরিকতার সাথে একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হতে হবে। ভয় ও অনুতাপের সাথে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের জন্য সকল অন্যায়ের কথা স্মরণ

www.amarboi.org

করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। অতীতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। একজন বিশ্বাসীকে এভাবেই সারাটা জীবন প্রচেষ্টা, সংশোধন ও তাওবার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে পরিপূর্ণ সফলতার জন্য। সফলতা কখন কিভাবে আসবে তা নিয়ে বিশ্বাসীদের হৃদয় অশান্ত হয় না বরং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কি না সে ভাবনা সদা-সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকে।

❐

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও সৎকর্ম

মানব জীবনের সবচেয়ে চরম পাওয়া হচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান লাভ। তাই কুরআনে সৃষ্টিকর্তার নিকট "হেদায়াত" বা সঠিক পথ প্রার্থনার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হেদায়াত বা সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনার সাথে সাথে মানুষকে সঠিক পথে চলার তাওফীক প্রার্থনা করতে হয়। কেননা সঠিক পথে নিজের সমস্ত কর্ম-জীবনকে পরিচালিত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। বস্তুত সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। মানুষ যেহেতু বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সেহেতু মানুষকে আল্লাহ্ সত্য ও সঠিক পথ গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যাঁরা বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের জন্য এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেন যে, তাদের জন্য কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করা এবং সঠিক পথে চলা সহজসাধ্য হয়ে যায়। বিশ্বাসীদের কাজ তখন এমন হয় যা মানুষের জন্য ভাল ও উপযোগী এবং মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। এসব কাজকে বলা হয়েছে সৎকর্ম।

সৎকর্মের মাধ্যমেই মানুষ তার মানবিক যোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। হেদায়াতের এ পর্যায়ে বিশ্বাসীগণ প্রকৃত মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা বিকশিত হন। তাদের সৎকর্মের সাথে হেদায়াত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

"যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।"

–সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯

কিন্তু এই সাথে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, যালিম ও ফাসিকদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন না। কুরআনের পরিভাষায় যালিম ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ফলে নিজের ও সমগ্র সৃষ্টির উপর যুলুম করার দোষে দোষী। আর ফাসিক হচ্ছে সেই সব সীমালংঘনকারী যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে। এরা নৈতিক সীমালংঘনকারী।

ইসলামের জীবনদর্শন অনুসারে মানব অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ

www.amarboi.org

ক. সৃষ্টিকর্তাকে চেনা,

খ. সৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা,

গ. সমগ্র বস্তুজগতের চরম পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা,

ঘ. ভাল ও মন্দকে যাচাই করা,

ঙ. যাকিছু ভাল ও কল্যাণকর তা গ্রহণ করা এবং যাকিছু মন্দ ও অকল্যাণকর তা বর্জন করা।

এ কারণেই আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান, চেতনা ও উপলব্ধি দান করেছেন। মানুষ শুধুমাত্র তার চেতনা, বুদ্ধি ও উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়েই নিজেকে পরিপূর্ণ ও প্রকৃত মানবীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

"যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

"সালেহ" অর্থ ভাল, যোগ্য, উপযোগী, পুণ্যবান ইত্যাদি আর সালেহীন হচ্ছেন সৎ বিশ্বাসী যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণকারী ও আমলকারী। সাধারণভাবে এদেরকে বলা হয় দীনদার। দীনদার অর্থ এ নয় যে, তাঁরা শুধু দীনি জীবন বা পরকালের জন্য হেদায়াতপ্রাপ্ত, বরং দুনিয়ার সকল কাজ যাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক করেন তাঁরাই প্রকৃত দীনদার বা ধর্মপরায়ণ। পবিত্র কুরআনকে অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই দীনদার হওয়া সম্ভব।

কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের দাবীদার হন কিন্তু কার্যকলাপে তার বিপরীত বলে গণ্য হন তখন তিনি মুনাফিক বলে পরিচিত হন। মুনাফিক হচ্ছে কপট বা ভণ্ড। মুখে এক রকম ও মনে অন্য রকম হওয়া হচ্ছে মুনাফিকের গুণ। মিথ্যা বলার অভ্যাস মানুষকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতএব, মিথ্যাকে পরিহার করে যাঁরা সত্য ও কল্যাণের পথ বেছে নিতে পারেন তাঁরাই সৎকর্মশীল ও সালেহীন হিসেবে গণ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ শুধু তাঁদের জন্যই অবধারিত হয়।

পবিত্র কুরআনে জান্নাত লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একজন বিশ্বাসী যত পাপীই হোক না কেন এক সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার অর্জন করবে, কিন্তু

www.amarboi.org

সৎকাজ ব্যতিরেকে কেউ জাহান্নামের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। অতএব ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধুমাত্র বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোনো শুভ ফল আশা করা যায় না। আবার বিশ্বাসহীন সৎকর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। অবিশ্বাসের কারণেই কোনো সৎকর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।

বস্তুত বিশ্বাস বা ঈমান একটি মহান সৎকর্ম। কিন্তু পারলৌকিক মুক্তির জন্য আনুগত্যের উচ্চারণ ও শপথ যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে প্রয়োজন, সৎকর্ম। বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী সকল কর্মসম্পাদন সৎকর্ম হিসেবে গণ্য।

পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط

"তারা হলেন তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, রোজাদার, রুকূ'-সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধাদানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী।"

বর্ণিত গুণাবলী ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মুসলমানরা কাংখিত মানবীয় নৈতিক মান অর্জন করতে সক্ষম হন। বিশ্বাসীদের এসব গুণাবলী অর্জনের জন্য তথা প্রয়োজনীয় নৈতিক মান অর্জনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে নৈতিক মান অর্জিত হয় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের নিকট হতে মানুষ যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে তবে সে বিভ্রান্ত হবে। অতএব, নৈতিক গুণাবলীতে উন্নত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাহার সৃষ্টি করার জন্য তথা একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সৎ ও উন্নত চরিত্রের ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক চারিত্রিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সংগে থাক।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯

www.amarboi.org

কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য এবং তদনুযায়ী আমল বা সৎকাজ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহর ভক্তদের নিকট থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ।

শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন। একমাত্র সরল পথের পথিকগণই অন্যকে নির্ভুল সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। এজন্য মানব সন্তানের নৈতিক শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে শিক্ষকদের শিক্ষা, নৈতিকগুণ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও প্রকৃত বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। কিন্তু সাধারণ মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদ প্রাপ্তিকেই চরম ও পরম পাওয়া মনে করে থাকে। পার্থিব আরাম-আয়েশের জন্য, যেসব পাঠ্যক্রম নির্ধারিত রয়েছে সেখানে চারিত্রিক মান উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চরম নৈতিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি বলে গণ্য তা হচ্ছে তার আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতা। মানুষের চারিত্রিক ভারসাম্যতা ও পূর্ণতা আনয়নের জন্যই হেদায়াত বা সঠিক পথের অনুসরণ করতে হয়। কুরআনের ভিত্তিতে যে জীবনবিধান আমাদের নিকট নবী মুহাম্মদ স.-এর শরীয়ত হিসেবে রয়েছে তা মানব সন্তানের চারিত্রিক ভারসাম্যতা সৃষ্টির জন্য সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট।

ইসলামী শরীয়ত সর্বোত্তম। কারণ এ শরীয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে ইনসাফ বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে মানুষ যেন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে পরিপূর্ণ মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। পবিত্র কুরআনে তাই বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা আরাফের শেষ ভাগে মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

... وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

www.amarboi.org

"... আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।"
—সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮১

সূরা আলে ইমরানে মুসলমানদের লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের কর্ম পরিধি নিসন্দেহে ব্যাপক এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বিস্তৃত। মানবতার মুক্তির জন্য মুসলমানরা তাই বৈরাগ্যকে যেমন কল্যাণকর বলে মনে করে না, তেমনি শরীয়তের সীমারেখা লংঘন করাকেও প্রগতি ও উন্নতির কারণ হিসেবে মনে করে না। তাঁরা ধর্মকে উপাসনালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকে মানব কল্যাণের পরিপন্থী হিসেবে মনে করে থাকে। সেই সাথে তাঁরা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিকে ধর্মীয় নীতিমালার আলোকে পরিচালিত করা মানবতার জন্য কল্যাণকর। আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলী মানব জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার মধ্যেই ভারসাম্যপূর্ণ মানব সমাজের বিকাশ ঘটবে বলে প্রকৃত বিশ্বাসীদের মৌলিক বিশ্বাস। মানব কল্যাণের এ চিন্তা-চেতনাকে তাই মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও পশ্চাৎমুখী ধ্যান-ধারণা হিসেবে দায়ী করা হলেও বিশ্বাসীগণ তাতে কুণ্ঠিত হয় না।

প্রকৃত বিশ্বাসীগণ সৎকর্ম করে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন কল্যাণ অর্জনের জন্য। কারণ নিছক লোক দেখানো সৎকর্ম কিংবা নাম-যশের নিমিত্তে যেসব সৎকর্ম করা হয় তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। মানব কল্যাণে আল্লাহর নির্দেশিত পথে কোনো অর্থ ব্যয় করা হলে বা সৎকাজ করা হলে তা কবুল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে যেমন ঃ

ক. শুধুমাত্র পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ ব্যয়,

খ. সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়,

গ. শরীয়ত নির্দেশিত পদ্ধতি ও পথে ব্যয়,

ঘ. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়।

www.amarboi.org

এছাড়া সৎকর্ম করার পর যদি গর্বের মনোভাব সৃষ্টি হয় কিংবা সৎকর্মের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ, করুণা কিংবা ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হয় তবুও তা আল্লাহর দৃষ্টিতে সৎকর্ম বলে গণ্য হবে না। অতএব একজন প্রকৃত বিশ্বাসী যত বড় বা যত বেশী সৎকর্মী হন না কেন সৎকাজের জন্য গর্ব করার অধিকার তাঁর নেই। কারণ তাঁর সৎকর্ম আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথপ্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না।"

সৎপথে ব্যয়, একটি সৎকর্ম। কিন্তু অসৎ পথের উপার্জন, সৎপথে ব্যয় গ্রহণীয় হয় না। অন্যায় পথে অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এমন সকল পন্থায় উপার্জন অসৎ বা অন্যায় উপার্জন। যেমন—চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি সকল পন্থাকে বাতিল বা অন্যায় পন্থা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "..... পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না, কোনো আমানতের খেয়ানত করবে না, কোনো ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের পণ্য বিক্রি করার সময় সে পণ্যের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে সে কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে তাকে অযথা উত্যক্ত করবে না।" অন্য এক হাদীসে আছে, "যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে এবং সত্য বলে—সেসব লোক ছাড়া কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহগারদের কাতারে উপস্থিত হবে।"

সৎপথে উপার্জিত সম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করা বৈধ নয়। এছাড়া যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যেমন—ইবনে আওসব রা. বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে সে শিরক করলো। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখলো সে শির্ক করলো এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করলো সে শিরক করলো।"–মুসনাদ, আহমদ

দান-খয়রাতের উপকারিতা এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী স. বলেছেন, "প্রতিদিন ভোরবেলায় দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের

www.amarboi.org

একজন বলেন, হে আল্লাহ! সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান করো। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।"–বুখারী, মুসলিম। কৃপণতা বলতে দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে কৃপণতা শুধু নয়, যারা অন্যের অধিকার বা হক আদায়ের ক্ষেত্রে শৈথিল্য বা কার্পণ্য প্রদর্শন করে তাদের কথাও বলা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের সাথে সাথে অন্যান্য সকল সৃষ্টির হক বা অধিকার আদায়ের জন্য বার বার তাগিদ পেশ করা হয়েছে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, কর্মচারী, পথচারী প্রভৃতির যথাযথ অধিকার প্রদান করার জন্য ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। যারা অন্যের ন্যায্য অধিকার দিতে কার্পণ্য করে তাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান। অতএব আল্লাহ্ দাম্ভিকতা পরিহার করতে বলেছেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

"... নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পসন্দ করেন না।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

কারণ সে অন্যের হকের ক্ষেত্রে কার্পণ্য অবলম্বন করে এবং নিজের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। আর যারা নিজের দায়িত্ব পালন করে না তারা আমানতের খেয়ানত করে থাকে। অথচ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ পেশ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا لا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার মীমাংসা করতে শুরু করো, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

বিশ্বাসীদের জন্য সকল প্রকারের আমানত রক্ষা করা একটি অপরিহার্য গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কোনো স্তরের মানুষের জন্য আমানত রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত আনাস রা. বলেন, "এমন খুব কম হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ স. কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি, "যার মধ্যে

www.amarboi.org

আমানতদারী নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।" আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই তার ধর্ম নেই।"–শোআবুল ঈমান

প্রচলিত অর্থে কারো নিকট কোনো বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধু আমানত হিসেবে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিটি পদ ও পদ-মর্যাদা আল্লাহর আমানত হিসেবে গণ্য। অতএব প্রতিটি কর্মচারী, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, মালিক নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ পদের আমানতদার। নিষ্ঠা, সততা ও ন্যায় বিচারের সাথে পদাধিকারী ব্যক্তি যদি তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন তবে তিনি পদ ও আমানতের খেয়ানতের দায়ে দায়ী হবেন। আমানতের খেয়ানত হচ্ছে মুনাফেকীর চিহ্ন এবং মুনাফেকী জঘন্যতম অপরাধ।

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ নবী স.-এর মাধ্যমে যেসব বাণী (কিতাব) পাঠিয়েছেন তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ জীবনে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যই আমানত তথা প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন জরুরী। যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য আসনের দায়িত্ব প্রদান প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। এজন্যই নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগকে একটি পবিত্র আমানত হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। জনগণ যেমন সরকার নির্বাচনে আমানতের দায়িত্ব পালনে বাধ্য তেমনি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের প্রতিটি পদে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান। সৎ ও যোগ্য প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা ব্যতিরেকে সমাজ জীবনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।

স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অবৈধ সুপারিশ, উৎকোচ, ঘুষ ইত্যাদি সমাজ হতে উৎখাত করার জন্য আমানতদারীর গুরুত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। পদ কারো ব্যক্তিগত বা বংশগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে। একজন বিশ্বাসী পদাধিকারী ব্যক্তি দায়িত্বশীল প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমে বদ্ধপরিকর হবেন কেননা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা, মতবাদ নির্বিশেষে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্য ফরয। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব নয়। বরং প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা এই যে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষ সবার জন্য ন্যায় বিচার করতে হবে। শত্রু যতই কঠোর হোক না কেন তাদের ব্যাপারেও ন্যায় ইনসাফ কায়েম করা বা যে কোনো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পরিহার করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অন্যায়ের জবাব অন্যায় দ্বারা নয় বরং ন্যায়বিচার দ্বারা শত্রুর অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই"এটি কুরআনের শিক্ষা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান।" মহানবী তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন, "কোনো আরবের, অনারবের উপর অথবা কোনো শ্বেতাঙ্গের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহভীতি ও সৎকর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভাই।" এর অর্থ আল্লাহভীতি ও সৎকর্মে বিশ্বাসীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করবে। যদি কোনো মুসলমান ন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অন্যায় উৎপীড়নের পথে চলে, তবে তার অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এ কারণেই প্রকৃত বিশ্বাসীগণ অত্যাচারী শাসকের চাকুরী ও পদ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। মহানবী স. এ প্রসংগে বলেন ঃ

ক. "যে ব্যক্তি হেদায়াত ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, তার আহ্বানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সমান সওয়াব পাবে। এতে তাদের সওয়াব কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করেন, তার আহ্বানে যতলোক পাপ কর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের (পাপীদের) গোনাহ কম করা হবে না।"

www.amarboi.org

খ. "যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। "

গ. "যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত।"

কুরআন ও সুন্নাহর এসব শিক্ষার আলোকে বিশ্বাসীগণ পৃথিবীতে সততা, সহানুভূতি ও সৎ চরিত্র পূর্ণ মানব সমাজ গঠনের লক্ষে কাজ করে থাকেন। অপরাধ ও অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন যার ফলে যে কোনো পরিস্থিতিতে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে তারা তাদের কর্তব্য কর্মে অবিচল থাকেন।

সূরা আল মায়েদার ৮ ও ৯ আয়াতে বিশ্বাসীদের লক্ষ করে আল্লাহ বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। যারা বিশ্বাসস্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমের এবং সত্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে অবিচল থাকা বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য গুণ। আদালতে সত্য সাক্ষ্য দেয়া যেমন ন্যায়বিচারের জন্য অপরিহার্য একই ভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য কথা এবং সত্যের পক্ষ অবলম্বন করা জরুরী।

সৎ ও সত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে সত্যের পক্ষ অবলম্বনের অর্থ অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মহানবী স. বলেছেন, "যারা কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও বাধা দেয় না, আল্লাহ তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।" বস্তুত "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" বিশ্বাসীদের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে আল্লাহর আযাব সকলের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিশ্বাসীদের কর্তব্য

www.amarboi.org

হচ্ছে কেউ জানুক বা না জানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে যে কোনো নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

মহানবী স. বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন ঃ

ক. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তীতা,

খ. সাধুতা ও পবিত্রতা।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তাদের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ ও আত্মসাতের দরজা খুলে দেন। (অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ ও অসৎকর্ম সত্ত্বেও তাদেরকে দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়)। অন্য এক হাদীসে আছে কিয়ামতের দিন সৎলোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অসৎলোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান কিয়ামতের দিন দেয়া হবে। ইহকাল হচ্ছে কর্মজগত। যেসব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আসে তা মানুষের নিকট নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়। যেন মানুষ সতর্ক হয় এবং সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়।

যাঁরা কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেন তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং এও বিশ্বাস করেন যে, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব ও পূর্ণত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করেন এবং প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় ও চেতনায় তা জাগরুক রাখেন তখনই তিনি সৎকর্মীতে পরিণত হন। কারণ তখন তার প্রতি পদক্ষেপে ও চিন্তায় এ ধারণা উপস্থিত থাকে যে, সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তা তাকে দেখছেন। তখন তার পক্ষে কোনো পাপ ও অসৎকর্ম করা সম্ভবপর হয় না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরকালে সৎকর্মের পুরস্কার দেবেন এ চিন্তা সদা সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকলে মানুষ প্রকৃত অর্থে একজন পূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে। বস্তুত ইহকাল হচ্ছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে জড়িত রয়েছে পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা বিপত্তি। তেমনি মন্দ কর্মের সাথে রয়েছে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। একজন মানুষকে বেছে নিতে হবে জীবনের প্রকৃত লক্ষ হিসেবে সে কোন্‌টাকে গ্রহণ করবে।

সামগ্রিক বিচারে বিশ্বাসভিত্তিক সৎকর্মকে যদি মানুষ নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তখন তার উচিত হবে সেই পথে নিজেকে পরিচালিত করা এবং অন্যকেও সেই পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হওয়া। এভাবেই

www.amarboi.org

মানব সমাজে নেমে আসতে পারে সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবন। কিন্তু মানুষ যখন ন্যায় ও সততার পথে চলতে অস্বীকার করে তখন মানুষ নিকৃষ্টতার সর্বনিম্নে পর্যায়ে নেমে যায় এবং পশুরও অধম হয়ে যায়। আবার মানুষ যখন সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তখন সে তার সৎকর্মের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। পরিপূর্ণ বিশ্বাস মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করতে সক্ষম।

❑

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও সরল পথের দিশা

বিশ্বাসী মুসলমানরা প্রতিদিন পাঁচবার নামাযের সময় কমপক্ষে সতেরবার মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট এই বলে প্রার্থনা করেন যে, "হে প্রভু! তুমি আমাদের সরল সোজা পথের দিশা দাও।" এ আকুতি ভরা প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি কর্মে, প্রতি আচরণে আমাদের এমন বিধি ব্যবস্থা শেখাও যা একেবারে নির্ভুল ও খাঁটি। আমরা সেই পথের দিশা পেতে চাই যা ভ্রান্তিহীন। যে পথ অনুসরণ করে আমরা পৌঁছে যেতে পারি কাংখিত গন্তব্যে। যে পথে চলে আমরা সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। সিরাতুল মুস্তাকিম বা সঠিক পথের দিশা এমন এক মহান নেয়ামত যা পাওয়ার জন্য বিশ্বাসীরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কারণ সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে পথনির্দেশই ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধানকারী। প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথের হেদায়াত হচ্ছে সেই অভীষ্ট লক্ষের দিকে ধাবিত হওয়া যা মানুষকে প্রকৃত মানুষে রূপান্তর করতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা তাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের সরল পথের দিশা দাও এবং সে পথ চিনিয়ে দেবার পর আমাকে সেই পথে অবিচল থাকার শক্তি ও সাহস দাও।" কারণ সরল পথ চেনা এবং সে পথে টিকে থাকার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। আল্লাহর অশেষ রহমত ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে সহজ-সরল ও সঠিক পথ চিনে নেয়া এবং সে পথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসীরা প্রতিদিন বার বার মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট আকুল আকুতি নিয়ে প্রার্থনা করেন, "তুমি আমাদের পথ দেখাও, আমার সামনে সত্যকে উন্মুক্ত করো, মিথ্যাকে দূরিভূত করো। চাকচিক্যময় এ পৃথিবীর অসংখ্য মত ও পথের মধ্য হতে আমাকে তুমি সেই পথ দেখাও যা আমার চিন্তা ও কর্মকে সাজুয্যপূর্ণ করতে পারে। আমাকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে পারে।"

হেদায়াত অর্থ গন্তব্যের দিকে অনুগ্রহের দ্বারা পথপ্রদর্শন করা। মানুষকে হেদায়াত প্রদান করতে পারেন শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা। হেদায়াতের প্রথম স্তর হচ্ছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতি। যার জ্ঞান নেই তার পক্ষে কোনো কিছুই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবার শুধু জ্ঞান দ্বারা মানুষ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। জ্ঞান মানুষকে জ্ঞানপাপী করে তুলতে পারে যদি না সেই জ্ঞানকে মানুষ তার বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতি দিয়ে সঠিক পথে

www.amarboi.org

ধাবিত করে। হেদায়াতলাভের জন্য মহান আল্লাহ্ মানুষকে দান করেছেন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতি। যার ফলে মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাৎ নিরূপণ করা।

সত্য ও মিথ্যা তথা আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম না হলে মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে না। বিশ্বাসীরা তাই বার বার প্রার্থনা করেন বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য। কারণ বুদ্ধি, বিবেক ও অনুভূতি ব্যতিরেকে কারো পক্ষে সরল পথের দিশা পাওয়া সম্ভব নয়।

যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার মন-মানসিকতা থাকে না তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে না। যারা নিজেকে জ্ঞানী মনে করে তারা অন্ধকারকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। সত্যের আগমনের পরও তারা সত্যকে গ্রহণ করে না। হেদায়াতের জন্য তাই প্রয়োজন একটি পরিচ্ছন্ন মন। যারা সুপথে, সরল পথে চলতে চান তাদেরকে পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে সরল পথের অনুসন্ধান করতে হবে। নতুবা সরল পথের দিশা পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মানুষ যখন বুদ্ধি, বিবেক ও অন্তরের অনুভূতির সাহায্যে সত্যকে গ্রহণ করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তখনই সে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে মনজিলে মকসুদের পথে বা অভীষ্ট লক্ষের দিকে। মানুষের মধ্যে এমন অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে হেদায়াত করে থাকেন। হেদায়াতপ্রাপ্তরাই কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যারা কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে তারা সে অনুযায়ী তাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারে। এদের পক্ষে কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করা এবং এর উপর আমল করা সহজসাধ্য হয়।

হেদায়াত লাভের এ প্রক্রিয়া হঠাৎ করে অর্জন করা সম্ভব নয়। হেদায়াত লাভের জন্য মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। সত্য ও সুন্দরকে শুধু জানলে বা বুঝলেই হবে না সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ম মাফিক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা ক্রমান্বয়ে সরল পথের দিশা পেতে থাকে। নেক আমল মানুষকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।"

www.amarboi.org

অতএব, এটি স্পষ্ট যে, সরল পথের দিশা বা আলোকিত পথের সন্ধান লাভ একটি তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়। অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হতে মানুষ কামেলে ইনসানিয়াত-এ পৌঁছে যেতে পারে। বস্তুত সরল-সঠিক পথের দিশা ছাড়া ইহকালীন ও পরকালীন কোনোটিরই সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। মধ্যমপন্থীরা দীন ও দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ লাভ করে থাকেন। মধ্যমপন্থী তারাই যারা সহজ-সরল ও সঠিক পথের অনুসারী। যারা কখনো কোনো কাজে সীমা অতিক্রম করে না। যারা অজ্ঞ, তারা অহংকারী, তারা সীমালংঘনকারী। এরা হেদায়াতপ্রাপ্ত নয়। সরল পথের সন্ধান লাভ করাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন। এর ফলে সে প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয় এবং সফলতা লাভ করে। সরল পথের সন্ধান যারা পেতে ব্যর্থ হয় তারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

যেসব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না তার প্রকৃত কারণ সম্ভবত এটি হতে পারে যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি রয়েছে। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন ব্যর্থতার মূল কারণ সরল পথের সন্ধান লাভের ব্যর্থতা। অতএব, সরল পথের দিশা পাবার জন্য বিশ্বাসীদের আজীবন সাধনা। সাধনার দ্বারা মানুষ অন্ধকার হতে আলোর দিকে এবং ক্রমেই উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর আলোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আলো এবং আরো আলোর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার ঐকান্তিক কামনা থেকেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করেন সেই পথের জন্য যা সহজ, সরল, সঠিক ও সুন্দর।

বিশ্বাসী ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে সরল পথের দিশা পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস পরিষ্কার ও সঠিক না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে অটল বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে না দাঁড়াবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মন-মগজে "সিরাতুল মুস্তাকিম" পাবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। এ কারণে ইসলাম ধর্মে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী এবং তাঁর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সম্পর্কে পরিষ্কার ও নির্ভুল ধারণার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে যারা কিয়ামত বা প্রতিদান দিবসের উপর বিশ্বাসী নয় তারাও সরল পথের দিশা পেতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের মনে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত না হবে যে, ইহকালীন জীবনের পরে আরেকটি জীবন আছে এবং পরকালীন অনন্ত জীবনের সফলতার জন্য তার চেষ্টা ও সংগ্রাম করা দরকার, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সহজ-সরল পথের জন্য আগ্রহী হবে না। যখন সে বুঝবে যে, মানব জীবনের পরম পাওয়ার জন্য তাকে সকল প্রকার স্বার্থপরতার

www.amarboi.org

ঊর্ধে উঠে সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথে চলতে হবে তখনই সে আল্লাহ ও তার রাসূল স. প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টায় ব্রতী হবে।

মানুষ যখন সিরাতুল মুস্তাকিমে চলার জন্য আকুতি অনুভব করে তখন সে প্রকৃতপক্ষে তার প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহর বিধি-নিষেধের উপরই চলতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে আল্লাহর পথে সে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের এ পথ দীর্ঘ, তবে সহজ সরল ও নির্ভুল এবং এ কারণেই কল্যাণকর। এ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন মানবজাতি এ কল্যাণকর পথকে বেছে নেবে অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত জীবনব্যবস্থাকে মানুষ সর্বাঙ্গে গ্রহণ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কেতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের কাছ থেকে সরল পথের দিশা খুঁজে নেবে।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব উপকরণ মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন। এগুলো মানুষকে চাইতে হয় না। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, যারা বিদ্রোহী কিংবা পথভ্রষ্ট তারাও এসব দান থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু সহজ, সরল পথের দিশা না চাইলে পাওয়া যায় না। এর জন্য মনের আকুতি থাকতে হবে। বস্তুত হেদায়াত হচ্ছে মানুষের জন্য এক মহান উপহার। এ উপহার পাবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে হয়, প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে হয়। খাঁটি মনে মহান আল্লাহর দরবারে ক্রমাগত প্রার্থনা করা ছাড়া এ উপহার পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া অনিচ্ছুক ব্যক্তি সরল পথের দিশা পেতে পারে না। এটি কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত তারা হেদায়াত প্রাপ্ত এবং যারা সৎকর্মশীল তারাই অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

পার্থিব জীবনে শুধু মাত্র নামায, রোযার মাধ্যমেই ইবাদাত হয় না। ইবাদাত বহুভাবে করতে হয়। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যাসমূহের অনুধাবন করা ইবাদাতের অংশ। ঠিক একইভাবে সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, নিজের ভুলের জন্য তাওবা করা, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, যাকাত প্রদান করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা, রাসূলের সুন্নত পালন করা ইত্যাদি সৎকর্মও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। হেদায়াত বা সরল পথের সন্ধান লাভের জন্য মানুষ এসব সৎকর্মের দ্বারা নিজেকে যোগ্য করে তুললেই সে হেদায়াতলাভের আশা করতে পারে। হেদায়াতলাভের জন্য ক্রমাগত প্রার্থনার পাশাপাশি নিজেকে যোগ্যরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা না থাকলে আল্লাহর মহান অর্ঘ্য "সিরাতুল মুস্তাকিম"

www.amarboi.org

লাভ করা সম্ভব হয় না। মানুষ নেক কাজ যতোবেশী করবে ততোবেশী সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে থাকবে।

অতএব এটি সহজেই বোধগম্য যে, হেদায়াত বা সরল পথের দিশা সকল স্তরের মানুষের জন্য প্রয়োজন। যারা সাধনার দ্বারা, সৎকর্মের দ্বারা, ইবাদাতের দ্বারা অনেক উচ্চ স্তরের মানুষে পরিণত হয়েছেন তারাও আরো আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য "সিরাতুল মুস্তাকিমের" প্রত্যাশী। সাধারণ একজন বিশ্বাসী থেকে শুরু করে নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষ এ মহান উপহার ক্রমাগত লাভ করে নিজেকে আরো উন্নত আলোকপ্রাপ্ত তথা কামিয়াব হতে চান। কেননা সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচেয়ে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী।

❐

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও জীবনাচরণ

সাধারণত মনে করা হয় যে, কালেমায়ে তাইয়েবা ও কালেমায়ে শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করা হলেই ঈমানদার বা বিশ্বাসী হওয়া যায়। কিন্তু কালেমার অর্থ ও মর্মবাণী উপলব্ধি করার পর আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। সহজভাবে কালেমার অর্থ বা বক্তব্য হচ্ছে ঃ

ক. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই।

খ. আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

গ. হযরত মুহাম্মদ স. আল্লাহ্র প্রেরিত দূত এবং সর্বশেষ রাসূল ও নবী।

ঘ. সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহ্র জন্য এবং সকল পাপের ক্ষমা করার অধিকার শুধু আল্লাহ্র।

ঙ. আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে এবং সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

কালেমার এসব বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধির জন্য কতিপয় বিষয়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। ইসলামের পরিভাষায় "আকীদা" বিশ্বাসের অংশবিশেষ। বিশ্বাসের ব্যাপকতা ও গভীরতা উপলব্ধির জন্য আকীদার বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

ক. আল্লাহ্র যাবতীয় গুণাবলীর উপর বিশ্বাস।

খ. আল্লাহ্র সৃষ্টি ফেরেশতাকুলের উপর বিশ্বাস।

গ. আল্লাহ্র বাণী তথা প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।

ঘ. আল্লাহ্র মনোনীত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।

ঙ. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

চ. তাকদীরের উপর বিশ্বাস।

ছ. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

বর্ণিত আকীদা বা বিশ্বাসগুলো একসূত্রে গাঁথা। একটি বিশ্বাসের সাথে আরেকটির সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। প্রকৃত ঈমানদার ও বিশ্বাসী ব্যক্তি সবকটি বিশ্বাসকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেন এবং জীবনে চলার পথে প্রতি ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এগুলোর কোনোটিকেই সত্য বলে

www.amarboi.org

মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে অবিশ্বাসীরা সত্য অস্বীকার করে। ফলে পৃথিবীতে এরাই নিকৃষ্ট মানুষ। সত্য অস্বীকারকারী মানুষেরা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করে না। ধর্মের অনুশাসন তারা মেনে চলে না। প্রবৃত্তির দাসত্ব এদেরকে অন্ধ করে ফেলে। তারা ভ্রান্ত। আলোকপ্রাপ্ত হয় না।

পবিত্র কুরআনে এদের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

"(হে রাসূল) তাদেরকে বলুন, তোমাদের কি বলে দেব কারা তাদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে অকৃতকার্য ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? তারা হচ্ছে সেইসব মানুষ যাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র দুনিয়ার মধ্যে ব্যয় করেছে ভ্রান্তির মধ্যে। অথচ তারা মনে করে যে, নেক আমলই করছে। তারা ঐসব মানুষ যারা আল্লাহ্‌র নিকট হাযির হবার ব্যাপারে বিশ্বাস করেনি। সেজন্য তাদের সব আমল ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন সে সবের কোনো মূল্য হবে না।"–সূরা কাহাফ ঃ ১০৩-১০৫

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন এমন এক নিরাকার সত্তায় যিনি সর্বশক্তিমান, ন্যায়-বিচারক ও মহান সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্‌র যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে প্রকৃত বিশ্বাসীদের মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় দোলা দেয় না। ফলে এরা হতে পারেন নির্ভীক, সৎ ও সংগ্রামী। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কখনো অন্যায় ও অসত্যের নিকট মাথানত করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা করার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌। বিশ্বজগত সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্‌ করেছেন, একদিন তাঁরই ইচ্ছায় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছুর লয় হবে। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছুর সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি এমন এক সত্তা যাঁর বিনাশ হবে না। তিনি নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারক। কোনো কিছু তাঁর সাধ্যের অতীত নয়। তিনি সকল শক্তি ও কল্যাণের উৎস এবং সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধে পাক-পবিত্র। তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। তিনি সর্বদ্রষ্টা। তিনি মানুষের গোপন কথা, আকুতি বুঝতে সক্ষম। তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক। সকল সম্পদের মালিকানা শুধু তাঁর। তিনি সকলের রিযিকদাতা। তিনি দয়াবান এবং তাওবাকারীর তাওবা কবুল করে থাকেন। অতএব, প্রকৃত বিশ্বাসীগণ তাদের সকল কাজ করে থাকেন শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর রহমত ও করুণা পাবার জন্য বিশ্বাসীরা

www.amarboi.org

লালায়িত। শুধু তাঁরই নিকট বিশ্বাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করেন আল্লাহর। এ পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর আইন ও শরীয়তের বিধান মেনে চলেন এবং শুধু আল্লাহকেই প্রকৃত বিশ্বাসীরা ভয় করেন। তাঁদের সকল নির্ভরতা শুধু আল্লাহর উপর। কেননা শুধু তিনিই আমাদের 'সুপথ' দেখাতে পারেন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের সকল কামনা-বাসনা শুধু এ একটি লক্ষকে কেন্দ্র করে ধাবিত হয়। তাই প্রতিদিন তাঁরা নিয়মিত আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিকট "সিরাতুল মুস্তাকিম"-এর জন্য প্রার্থনা করেন। "সিরাতুল মুস্তাকিম" হচ্ছে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। না চাইলে এ নেয়ামত পাওয়া যায় না। কোনো অনিচ্ছুক ব্যক্তি হেদায়াত পাবার যোগ্যতা অর্জন করে না।

আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিয়ে থাকেন। পার্থিব অর্থ-সম্পদ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয় ভালো ও মন্দ উভয় পথে। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে দুনিয়ার কোনো নিয়ামত থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। কিন্তু "সিরাতুল-মুস্তাকিম" বা সঠিক পথের দিশা পাওয়ার জন্য মানুষকে অনবরত প্রার্থনা করতে হয়। "সিরাতুল মুস্তাকিম" পাওয়ার অর্থ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের সরোবরে অবগাহন করা। প্রকৃত বিশ্বাসীদের চূড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে তাই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা। মুসলমান বিশ্বাসীগণ তাই প্রতিদিন প্রার্থনায় "সূরা ফাতিহা" পাঠের মাধ্যমে সঠিক পথের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুতি জানিয়ে থাকেন। সূরা ফাতিহাকে বলা হয়েছে "উম্মুল কিতাব" বা কুরআনের মূলকথা।

সূরা ফাতিহার প্রাণসত্তা বা মর্মকথা যিনি বুঝতে সক্ষম হন কুরআনের নির্দেশিত পথে চলা তাঁর জন্য সহজ হয়ে পড়ে। সমাজের দূরবস্থা ও অশান্তি দূর করার জন্য বিবেকসম্পন্ন মানুষের যে আকুতি সেই আকুতির সুন্দরতম প্রকাশ হয়েছে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা পূর্ণ তাওহীদবাদী। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নিকট তাঁদের মাথানত হয় না। বিশ্বাসীদের প্রার্থনা তাই "আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" এরপর বিশ্বাসীগণ আল্লাহর নিকট আর্জি পেশ করে বলেন, "আমাদেরকে সহজ-সঠিক পথ দেখাও। ঐসব মানবের পথে আমাদের পরিচালিত করো যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যারা কখনো বিভ্রান্ত হয়নি এবং যাদের উপর তোমার গযব পড়েনি।"

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথমে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ সূরাটি পূর্ণাঙ্গ প্রথম সূরারূপে হযরত মুহাম্মদ স.-এর নিকট নাযিল হয়েছিল। সামাজিক অনাচার, অবিচার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য হযরত মুহাম্মদ স.-এর মন যখন অস্থির হয়ে উঠেছিল তখন

www.amarboi.org

তিনি মক্কার অদূরে হেরা পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। "জাবালূন নূর" বা আলোর পাহাড়ের গুহায় ধ্যান নিমগ্ন মুহাম্মদ স. আল্লাহর নিকট পথের দিশা চাইতেন। হঠাৎ একদিন জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট আবির্ভূত হলেন ওহী বা আল্লাহর বাণী নিয়ে। এ ঘটনায় মুহাম্মদ স. ভীত হয়ে পড়েন। একদিকে ভীতি, অন্যদিকে আল্লাহর বাণীর জন্য আকুলতা নবী মুহাম্মদ স.-কে অস্থির করে তুলেছিল। এর কিছুদিন পরে আবার জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে সাতটি আয়াত নাযিল হলো। এভাবে ক্রমান্বয়ে তেইশ বছর ধরে আল্লাহর বাণীসমূহ সন্নিবেশিত হলো পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে যা বিশ্বাসী মুসলমানদের নিকট সঠিক পথের দিশা হিসেবে অবশ্য গ্রহণীয়। বিশ্বাসী মুসলমানেরা মানুষের দৃষ্টিবহির্ভূত আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস করেন। ফেরেশতা কতজন আছেন মানুষ তা জানে না।

কিন্তু বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রতি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা থাকেন। এদের কাজ হচ্ছে মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করা। একজন ফেরেশতা ভালো কাজের ও অন্যজন মন্দ কাজের বিবরণ সংরক্ষিত করেন। তাঁদেরকে বলা হয় "কিরামান কাতেবীন"বা সম্মানিত লিপিকার। বিশ্বাসীরা আরো বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর "মুনকার" ও "নাকির" নামের দু'জন ফেরেশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এছাড়া আরো চারজন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এরা হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল আ., হযরত মিকাঈল আ., হযরত আযরাঈল আ. ও হযরত ইসরাফীল আ.। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস বিশ্বাসীদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

সমগ্র সৃষ্টিজগত ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ফেরেশতার মাধ্যমে নবীদের নিকট কিতাব নাযিল হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা যখন সিংগায় ফুঁক দেবেন সেদিন শুরু হবে মহাপ্রলয় এবং সংঘটিত হবে শেষ বিচার। মানুষের অবধারিত মৃত্যু হবে আল্লাহর নির্দেশে একজন ফেরেশতার দ্বারা এবং আমৃত্যু মানুষসহ সকল সৃষ্ট জীবের রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে থাকেন ফেরেশতার মাধ্যমে। মৃত্যুর পরে দুই ফেরেশতা মানুষকে তার "বিশ্বাস" সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং মানুষের সকল কর্মের বিবরণ সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা। গভীর প্রত্যয়ের সাথে মানুষ যখন এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, তখনই সে হয়ে ওঠে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বাস্তব নমুনা।

www.amarboi.org

জনগোষ্ঠীর নিকট কালে কালে নবী-রাসূলদের মারফত আল্লাহর "পথনির্দেশনা" বর্ণিত হয়েছে। তাই বিশ্বাসী মুসলমানরা সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। যেসব নবীদের নাম কুরআন-হাদীস থেকে পাওয়া যায় না তাঁদের প্রতি কোনোরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বিশ্বাসীদের পক্ষে সমীচীন নয়। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক নবীর আহ্বান বা দাওয়াতের মর্মবাণী এক। রেসালাত ও নবুওয়াতের শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নয়, নবীর আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকা বিশ্বাসীদের জন্য বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানরা, তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে মান্য করে। নবী মুহাম্মদ স.-এর প্রতিটি নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলা বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কোনো নবীর আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসার তাকিদে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে বিশ্বাসীরা নবী স.-এর-আদর্শকে নিজেদের জীবনাদর্শ হিসেবে গণ্য করেন। আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলের ত্যাগ ও সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকৃত বিশ্বাসীগণ নবীদের প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। নবী-রাসূলদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সাথে বিশ্বাসী মুলসমানগণ "খতমে নবুওয়াতে" বিশ্বাসস্থাপন করেন। "খতমে নবুওয়াত"অর্থ নবী মুহাম্মদ স. পর্যন্ত এসে নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না।

নবী মুহাম্মদ স. প্রদর্শিত জীবনাদর্শ সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য। যতোদিন এ দুনিয়া টিকে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর মনোনীত ধর্ম (দীন ইসলাম) সমগ্র মানব সমাজের মুক্তির দিশা হিসেবে কাজ করবে। বিশ্বাসী মুসলমানগণ তাই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নিকট শুধু তারাই নাজাত পাবে যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনে শুধু তাঁর নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, অর্থাৎ বিশ্বমানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য নবী মুহাম্মদ স. যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন তার সঠিক ও সার্বিক অনুসরণ বিশ্বাসীদের জন্য জরুরী বা অবশ্য পালনীয়।

যেহেতু মুসলমানগণ সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেন সেহেতু স্বাভাবিকভাবে তাঁরা সকল "আসমানী কিতাব" যথা ঃ তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, সকল আসমানী কিতাবের বুনিয়াদী বা মৌলিক শিক্ষা এক ও অভিন্ন।

www.amarboi.org

কিন্তু বিশ্বাসী মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে শুধু কুরআন তার আদি, আসল আকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু অন্য তিনটি কেতাব বহুলাংশে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এর কোনোটিই তার প্রকৃত রূপে বর্তমানে নেই। অতএব, আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ দীন ইসলামের জন্য বিশ্বমানবতাকে কুরআনের আশ্রয়ে ও ছায়ায় নিজেদের জীবনাচরণ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বাসী মুসলমানগণ তাই শুধু কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেন না, বরং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআনে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার দিকনির্দেশনা রয়েছে। অতএব ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—প্রতিটি বিষয়ে কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান মেনে চলা হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনের আদেশ-নির্দেশ বা মূলনীতির বিপরীত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা বা মেনে চলা কুরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল বলে গন্য।

অতএব, সংগত কারণে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানগণ কুরআন ও সুন্নাহকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়ে সমাজ জীবনে তা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচণ্ড তাকিদ অনুভব করেন এবং সে অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে সচেষ্ট হন। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন যে, এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পর অনন্ত চিরস্থায়ী জীবনের শুরু হবে। নুতন জগতে মানুষের পুনঃজীবন লাভের বিশ্বাসকে পরকালে বিশ্বাস বলা হয়। নতুন জগতে শুরু হবে মহাবিচার। প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে পুরস্কার আর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্বাস ও সৎকর্মের দ্বারা যারা উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবেন তারা পুরস্কারস্বরূপ পাবেন জান্নাত। যাঁরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি জাহান্নাম লাভ।

কে জান্নাতবাসী হবেন এবং কে জাহান্নামবাসী হবেন তার সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহর রয়েছে। অবশ্য মানুষকে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মারফত জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বাসভিত্তিক কোন্ ধরনের কাজের বিনিময়ে মানুষ জান্নাত লাভের আশা করতে পারে এবং কোন্ ধরনের কাজের দ্বারা মানুষ জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে থাকে। মানব জীবনের লক্ষ ও আদর্শ কি হবে, তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর। মানুষ যখন তার চলার পথের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে

www.amarboi.org

সক্ষম হয়, তখনই সে একজন সার্থক মানুষে পরিণত হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে মানুষ তখন নিজের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাকে আল্লাহর নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে নির্ভুল প্রত্যয়ের বলে মানুষ আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মাথানত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, বিবেকের স্বতঃস্ফূর্ত তাকিদেই মানুষ বেছে নেয় স্বেচ্ছামূলক সংহত, সংযত এক আদর্শ জীবন।

পবিত্র কুরআনে তাই "ঈমান" বা বিশ্বাসকে তুলনা করা হয়েছে এমন এক ফলবান বৃক্ষের সাথে যার মূল মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা অনন্ত আকাশে প্রসারিত অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ে নির্ভুল প্রত্যয়ের শিকড় এমনভাবে গেঁথে থাকে যা কোনো অবস্থাতেই উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। বিশ্বাস নামক ফলবান বৃক্ষটি শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে নয়, বরং অনন্ত জগতের অনন্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে অবিশ্বাস হচ্ছে একটি ভ্রান্ত প্রত্যয়। অবিশ্বাস হচ্ছে সেই বৃক্ষের মতো যা সহজেই উপড়ে ফেলা যায়। এ বৃক্ষের রূপ-রস আপাতসুশোভিত মনে হলেও বাস্তবে তা অতি ঠুনকো এবং মানব জীবনের জন্য তা কল্যাণকর নয়। ভ্রান্ত প্রত্যয়বাদীদের জীবন তাই ভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاۤءِ ۝ تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ ۝

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ কালেমায়ে তাইয়েবার কি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? এ হচ্ছে এমন এক উত্তম বৃক্ষ যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় আর শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তারিত। তা তার পরওয়ারদেগারের ইচ্ছানুযায়ী সর্বদা ফল দান করে চলেছে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে করে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। আর অপবিত্র কালেমার (ভ্রান্ত প্রত্যয়) দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের মতো তা মাটির উপরিভাগ থেকেই উপড়ে ফেলা যায়। তাতে কোনো ভালাই নেই। আল্লাহ

www.amarboi.org

ঈমানদারগণকে একটি সুদৃঢ় বাণীর সাহায্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই দৃঢ়তা দান করেন এবং যালেমদেরকে এরূপ পথভ্রষ্ট অবস্থায় ত্যাগ করেন। আর আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন।"

–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭

কুরআনের এ বাণীর যথার্থতা যুগে যুগে সুপ্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বাস ও বিশ্বাসভিত্তিক জীবন আচরণ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভ্রান্ত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবনাদর্শ বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বিশ্বাস বা ঈমান হচ্ছে চরিত্র গঠনের এক মানসিক ভিত্তি। ফলে বিশ্বাসীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা উন্নততর হয়ে থাকে। কারণ বিশ্বাসীরা জানেন যে, সত্য পথ বা "সিরাতুল মুস্তাকিম" শুধু একটি। আরবীতে ঈমান শব্দের উৎপত্তি "আমান" থেকে যার অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি। "আমান" থেকে আমানত শব্দের উৎপত্তি। বস্তুত "ঈমান" মুসলমানদের আমানত বিশেষ। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানরা এ আমানতের খেয়ানত করতে পারে না। মানব চরিত্র যখন সুদৃঢ় ঈমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তার আমল নেক আমল হয়ে থাকে। কিন্তু ঈমান বা বিশ্বাস যখন দুর্বল হয় তখন মানব চরিত্র হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল। বিশ্বাসীরা জানেন যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি মাত্র। অতএব, আনুগত্য পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। জবাবদিহি করতে হবে শুধু আল্লাহ্র নিকট। জবাবদিহিতার এ চেতনা মানুষকে সচেতন করে তোলে নিজের সম্পর্কে। মানব মনে সৃষ্টি করে আত্মসম্মানবোধ ও দায়িত্ববোধ। যেহেতু বিশ্বাসীরা জানেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ করা সম্ভব নয় সেহেতু পৃথিবীতে কারো নিকট মাথানত করা প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্বাসীরা জানেন যে, মানুষের যাকিছু গৌরব, শক্তি ও যোগ্যতা তা তার নিজের নয়, বরং আল্লাহ্র দান। বিশ্বাসীরা এও জানেন যে, মানুষের ক্ষমতা বা গর্ব যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্ খর্ব বা বিনষ্ট করে দিতে পারেন। শক্তি কেড়ে নিতে পারেন, দম্ভ ও দাপট চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন। স্বভাবতই প্রকৃত বিশ্বাসীরা হয়ে ওঠেন বিনয়ী, নম্র ও নিরহংকার। প্রকৃত বিশ্বাসীগণ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হন না, কারণ তাঁরা জানেন যে, সৎকর্মের মাধ্যমেই শুধু মুক্তিলাভ বা জান্নাতের শান্তি লাভ সম্ভব। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন কোনো বিশ্বাসী মানুষ সৎ ও মহৎ কাজ করার পথে এগিয়ে যান তখন তার হৃদয়ে এ প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্র সাহায্য ও

www.amarboi.org

শক্তি রয়েছে তার সাথে। ফলে তিনি দৃঢ় চিত্তে কাজ করতে সক্ষম হন। হতাশা তাকে ঘিরে ধরে না। কারণ তিনি জানেন আল্লাহর মহিমা, শক্তি ও অনুগ্রহ অসীম। আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি এ নিশ্চিন্ততা তাঁকে অনুপ্রেরণা যোগায় নব উদ্যম ও নব প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রকৃত মুসলমানদেরকে আল্লাহর আইন তথা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। মানুষের প্রতিটি কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিচার হবে এ বোধ যতো বেশী জাগরূক থাকবে, মানুষ ততোবেশী আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সক্ষম হবে। এ কারণেই প্রকৃত বিশ্বাসীরা লোভ, লালসা, হিংসা ও বিদ্বেষের ঊর্ধে থাকতে সক্ষম হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের ধন, সম্পদ ও জীবন কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধ হন।

অন্যদিকে বিশ্বাসহীনতা মানুষকে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারে। অবিশ্বাস বা "কুফর" হচ্ছে চরম মূর্খতার নামান্তর। সৃষ্টির সহজাত ধর্মের বিরুদ্ধে এক অন্যায় বিদ্রোহ। সৃষ্টিজগতের সবকিছু নিজ নিজ ধর্ম বা সহজাত প্রাকৃতিক আইন মেনে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের বাইরে চলার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে ইচ্ছে করলে আল্লাহর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতেও পারে আবার নাও পারে।

মানুষ যদি অবিশ্বাসী হয় এবং আল্লাহর আইন মেনে চলতে অস্বীকার করে, তাতে সৃষ্টিকর্তার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং অবিশ্বাসী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সে নিজেকে নিক্ষেপ করে অজ্ঞতার অন্ধকারে। আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ ছেড়ে সে চলতে শুরু করে বাঁকা পথে। ফলে তার আচরণ বিকৃতির পথে ধাবিত হয়। অবিশ্বাসীরা তাই সংকীর্ণ ও কুপমণ্ডুকতায় আক্রান্ত হয়। তারা মহান সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির নিকট মাথানত করে। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে সে তার কল্যাণ, অকল্যাণের মালিক মনে করে। মানুষের ভয়ে সে ভীত হয় এবং মানুষের নিকট সে প্রত্যাশা করে। পার্থিব কোনো সফলতার জন্য সে গর্বিত হয়। কারণ সে মনে করে তার সফলতা একান্ত তার নিজের যোগ্যতার ফসল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে তারা পার্থিব শক্তির সাহায্যেও বিরোধিতার উপর নির্ভরশীল মনে করে। এর ফলে একদিকে যেমন অহংকার এদের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে, অন্যদিকে পার্থিব কোনো সফলতার জন্য এরা চাটুকারিতা, তোষামোদ, ষড়যন্ত্র ও যাবতীয় নিকৃষ্ট পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। অপরের সফলতায় তারা ঈর্ষাকাতর হয়। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ঘুষ প্রভৃতির আশ্রয়ে তারা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। সৎকর্মের প্রতি বা নীতি-নৈতিকতার অনুশাসন সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা নির্বিকার।

www.amarboi.org

জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসীদের ধারণা অবিশ্বাসীদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে বিশ্বাসীরা চিরস্থায়ী জীবনের পরীক্ষাগার বলে মনে করেন। ফলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণ হবে তাঁর মালিকের নির্দেশে। নিজের খুশিমত বা যে কোনো পন্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ অর্জন, ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার মানুষের নেই। শুধু আল্লাহর নির্দেশিত পথে ও পদ্ধতিতে যাবতীয় সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ব্যবস্থা করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহর নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করে নিজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করা কিংবা প্রদর্শিত পন্থা ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা সৃষ্টিকর্তার প্রতি নাফরমানী করার নামান্তর।

বিশ্বাসীরা মনে করেন এ পৃথিবী হচ্ছে সৎকর্ম ও সাধনার দ্বারা নিজেকে গড়ে তোলার স্থান। পরকালীন জীবন হচ্ছে প্রতিফল লাভের কাল। সৎকাজের সুযোগ মানুষ শুধু মৃত্যুর আগ পর্যন্তই পেয়ে থাকে। অতএব, মানুষের প্রতিটি আচরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাকিছু পরকালে মানুষের প্রাপ্য তা ইহকালের কাজের প্রতিদান। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী করা হবে। একজনের দায়িত্ব অন্য কারো পক্ষেই নেয়া সম্ভব হবে না। সেখানে কোনো পুণ্য বিফলে যাবে না এবং কোনো পাপকেই ছেড়ে দেয়া হবে না। অতএব, বিশ্বাসীগণের জীবনবোধ গড়ে ওঠে দায়িত্বানুভূতির ভিত্তিতে। ফলে প্রকৃত বিশ্বাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ হয়ে থাকে—

ক. বিশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট মাথানত করেন না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কোনো পুরস্কার প্রত্যাশা করেন না।

খ. আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এ বিশ্বাস থেকে সব কাজ করেন ঈমানদারীর সাথে, ফলে বিশ্বাসীদের চরিত্রে থাকে আল্লাহভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা।

গ. বিশ্বাসীরা তাঁদের চিন্তায়, চেতনায় ও আচরণে সত্য-ন্যায়কে আঁকড়ে ধরেন।

ঘ. বিশ্বাসীরা আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করেন না এবং প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হন না।

ঙ. বিশ্বাসীরা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করেন না এবং কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন না।

চ. বিশ্বাসীরা প্রতিশ্রুতি পালন করেন এবং কারো আমানত বিনষ্ট করেন না।

ছ. বিশ্বাসীরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায় করেন।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমে (১৫১-১৫৩ আয়াত) আল্লাহ্ মানুষকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সরল পথের দিশা হিসেবে কতিপয় নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বাসীদের জন্য এসব নির্দেশ দিকনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে থাকে। নির্দেশগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

খ. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।

গ. দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করো না।

ঘ. প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নির্লজ্জতার কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।

ঙ. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।

চ. সদুদ্দেশ্য ছাড়া এতিমের সম্পদের কাছে যেও না।

ছ. পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে করবে।

জ. স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও হক কথা বলবে।

ঝ. প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ করবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের জন্য রয়েছে এমন অসংখ্য দিকনির্দেশিকা। বিশ্বাসীরা কুরআনকে নিজেদের জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কুরআনের আলোকে নিজেদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ○

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাক।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯

(২)

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো। তাহলে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

(৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ قف

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সবর করো এবং সবরের প্রতিযোগিতা করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০

④

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ لا

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো যেন তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১

⑤

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط

"তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকেন।"

–সূরা হাদীদ ঃ ৪

⑥

اِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ـ

"আল্লাহ্র নিকট আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই গোপন থাকে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৫

⑦

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ○

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭০

⑧

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ○

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে চলে আল্লাহ্ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং যে স্থান সম্পর্কে সে ধারণাও করেনি, সেখান থেকে তিনি তাকে রিযিক দেন।"–সূরা তালাক ঃ ২-৩

⑨

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ

"আর সেই, আল্লাহ্র উপর নির্ভর করো যিনি চিরঞ্জীব ও অমর।"

–সূরা ফুরকান ঃ ৫৮

www.amarboi.org

(১০)

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

"আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ১১

(১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তার একথার উপর অটল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুশ্চিন্তাও করবে না। তারা দুনিয়ায় যে কাজ করেছে তার বদলে জান্নাতবাসী হয়ে চিরকাল সেখানে থাকবে।"-সূরা আহকাফ ঃ ১৩-১৪

(১২)

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ـ

"তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৮

(১৩)

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

"তোমরা যে কোনো সৎকাজ করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫

(১৪)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص

"তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য কর।"
-সূরা আল মায়েদা ঃ ২

(১৫)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"তোমাদের ভিতর এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকতে থাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। যারা একাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

(১৬)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

"তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনের প্রতি ও প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনই পসন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী এবং নিজেকে বড় মনে করে আত্মগৌরবে বিভ্রান্ত।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

(১৭)

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

"লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য কেউ যদি গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দেয় অথবা কোনো ভাল কাজের জন্য কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বিরাট প্রতিদান দেব।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৪

www.amarboi.org

(১৮)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا لا

"আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

(১৯)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ

"মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সুসংগঠিত করে নাও।"-সূরা হুজুরাত ঃ ১০

পবিত্র কুরআনের এভাবে সৎকর্ম, সত্যনিষ্ঠা, বিনয়, আল্লাহভীতি, অবিচল নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদির বিষয়ে বার বার তাকিদ এসেছে। বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে প্রকৃত মু'মিনরূপে গড়ে তোলার জন্য তীব্রভাবে সচেষ্ট হলে দৃঢ় ও খালেস চরিত্রের মানুষরূপে গড়ে ওঠা সম্ভব। এভাবে প্রতিটি মানব চরিত্র যদি প্রকৃত বিশ্বাসীর চরিত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তাহলেই হানাহানিপূর্ণ ঐ মানব সমাজে নেমে আসবে অনাবিল শান্তি, গড়ে উঠবে এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একথা গভীর প্রত্যয়ের সাথে বলা যায়।

❒

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও ইবাদাত

জীবনের চলার পথে অবিশ্বাসের দোলায় আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে থাকি। অবিশ্বাসীদের মৌল বিশ্বাস "নাস্তিক্যবাদ" আমাদের বিশ্বাসের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। নাস্তিক্যবাদের মূল অর্থ হলো সৃষ্টিজগতের কোনো স্রষ্টা আছেন একথা অস্বীকার করা। নাস্তিক্যবাদের পেছনে যে মনোভাবটি কাজ করে থাকে তা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজেই প্রভু। সে মনে করে তার কোনো স্রষ্টা নেই। আপনা-আপনি প্রাকৃতিক নিয়মে তার জন্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তার মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুই তার চরম পরিণতি। মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই। পরকাল নেই, "চূড়ান্ত বিচার" করা হবে না। ফেরাউন যেমন নিজেকে প্রভু বলে দাবি করতো, তেমনি প্রতিকালেই এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে এক ধরনের ফেরাউনী মনোবৃত্তি কাজ করে থাকে। এ মনোবৃত্তি থেকেই নাস্তিক্যবাদের জন্ম।

প্রাকৃতিক নিয়মের শৃংখলা কিভাবে এলো ? নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সবকিছু নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলা কি সম্ভব ? সৃষ্টিজগতের প্রতিটি পদার্থের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক নিয়মতান্ত্রিকতা রয়েছে তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলে মানুষ আর অবিশ্বাসী হতে পারে না। অতএব নাস্তিক্যবাদ এক ধরনের মূর্খতা বা অজ্ঞতা। মূর্খতা থেকে জন্ম নিয়েছে অহমবোধ। অবচেতন মনে মানুষ তাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা লালন করে। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে সে বলে "নেই"। সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।

অবিশ্বাসীরা এই ভেবে আত্মপ্রতারিত হয় যে, আমি যেহেতু জানি না সেহেতু অস্বীকার করি। আমি অস্বীকার করি কারণ আমি অজ্ঞ। ঠিক যেমনটি বলেছিল ফেরাউন, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِى ج "আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু আছে বলে জানি না"—সূরা আল কাসাস ঃ ৩৮। যেহেতু অবিশ্বাসীরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সেহেতু তারা ফেরেশতা, ওহী, রিসালাত ও কিয়ামতকে অস্বীকার করে। অতএব ধর্মের বিধি-নিষেধ তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পাপ-পুণ্য বলে তাদের কাছে কিছু নেই। ন্যায় ও অন্যায় নেই। যেহেতু অবিশ্বাসীদের কোনো প্রভু নেই, সেহেতু তারা কারো আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্যও নয়।

নাস্তিক্যবাদ এভাবে মানুষকে একজন স্বেচ্ছাচারীতে রূপান্তর করে। ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী হতে আগ্রহী বলেই কি এক শ্রেণীর মানুষ

www.amarboi.org

নাস্তিক্যবাদের প্রতি আগ্রহী। মনোবিজ্ঞানীগণ সম্ভবত একজন নাস্তিকের এ মনোভঙ্গীর ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি মনে করি এক ধরনের পলায়ন মনোবৃত্তিই মানুষকে নাস্তিক্যবাদের আশ্রয় গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। যারা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় তারাই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। পাপ ও অন্যায়ের বিচার হোক তা তারা চায় না। এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও তারা আগ্রহী নয়। কারণ এসব চিন্তার ফলে তার জীবনে চলার ক্ষেত্রে সীমারেখা টেনে দেয়া হবে। স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্রে কোনো বাধা মানতে যারা রাজি নয়, তারাই নাস্তিক্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের সকল অপকর্ম ও অন্যায় কাজের সমর্থন ও সাহস জোগানোর চেষ্টায় লিপ্ত।

কিন্তু বিশ্বাসীগণের চিন্তা ও চেতনার ভিত্তি হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"–সূরা যারিয়াহ ঃ ৫৬। এর অর্থ হলো মানুষ ও জ্বিন শুধুমাত্র আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করবে এবং এককভাবে আল্লাহরই ইবাদাত করবে। মানুষ শিরক করবে না অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকবে না বা প্রভু হিসেবে মানবে না। এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, বিশ্বাসীদের মূল বক্তব্য মেনে নিয়ে জীবনকে গতিশীল করার জন্য আমাদের কি কি করা প্রয়োজন ? এর সাধারণ উত্তর হচ্ছে যে, মানুষকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রথমতঃ মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষকে বিশ্বাসভিত্তিক দীন বা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ দীনের বাণী যার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে সেই মহান মানব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ, নবী ও মনোনীত ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা মানুষের অবশ্যই থাকতে হবে। এ তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন ব্যতিরেকে পরিপূর্ণতা আসে না এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণতা না আসার ফলে মানুষ বিভ্রান্তির কবলে পড়ে যায়। বিভ্রান্তি থেকে সৃষ্টি হয় নাস্তিক্যবাদের।

এখানে স্মরণীয় যে, আল্লাহ তাঁর নবী এবং তাঁর মনোনীত দীন বা ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, বরং এসব জ্ঞানের আলোকে

www.amarboi.org

যাবতীয় কাজ মানুষকে সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য শুধু নিজে সম্পাদন করলেই হবে না, অন্যকেও এ ন্যায়ের পথে, আলোর পথে আহ্বান করতে হবে। বিশ্বাসীদের জন্য এ পথটি কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে বাধা-বিপত্তি, হয়রানি ও অত্যাচারকে মেনে নিয়েই বিশ্বাসে অটুট থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

"কালের শপথ, নিশ্চয় সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত, তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পর সত্যের ও ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান করেছে।"–সূরা আছর ঃ ১-৩

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতসমূহে মানুষের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় ব্যাপক বিষয়াদি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, "যদি মানুষ কেবল এ আয়াতসমূহের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করে তবে তাই তার শিক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে।" মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য অলোকবর্তিকা রূপে মানুষের নিকট তা প্রতিভাত হবে।

ঈমান, সৎকর্ম এবং অপরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করা প্রতিটি মানুষের জন্য অতীব জরুরী। ঈমান ও সৎকর্মের সাহায্যে মানুষ নিজেকে সংশোধিত করবে এবং অন্যকেও সত্য পথের উপদেশ দিবে। নিজে যেমন ধৈর্য অবলম্বন করবে অন্যকেও ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিবে। বিশ্বাসীদের মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের কল্যাণ চিন্তা ও প্রচেষ্টা জরুরী। সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য মানুষের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সৎকর্ম সম্পাদন ও ধৈর্যধারণ।

আল্লাহকে চেনা ও জানা বিশ্বাসীদের প্রথম ও প্রধান কাজ। মানুষ তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে শুধুমাত্র তাঁর নিদর্শনসমূহ ও সৃষ্টিরাজির মধ্য দিয়ে। মানুষ যদি তার নিজের এবং বিশ্বচরাচরের সকল সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে সবকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই হুকুম প্রদানের অধিকারী। তিনি কল্যাণময় এবং আমাদের একমাত্র প্রভু। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

(ক)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

"হে মানবজাতি, ইবাদাত করো তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।"–সূরা বাকারা ঃ ২১

(খ)

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। সবই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রেখো, সৃষ্টি ও আদেশ প্রদানের মালিক তিনিই, চির কল্যাণময় মহান আল্লাহ, তিনিই বিশ্বজগতের প্রভু।"–সূরা আরাফ ঃ ৫৪

আল্লাহ মানুষের এবং বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা। তিনি শুধু সৃষ্টিই করেননি সবকিছুর প্রতিপালনও তিনিই করে থাকেন। তাঁর নির্দেশে সমগ্র সৃষ্টিজগত প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরই নির্দেশে সবকিছু পরিচালিত। অতএব সবকিছুর মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তিনি কল্যাণময়, তাই মানুষের উচিত একমাত্র তাঁর ইবাদাত করা, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা এবং পরিপূর্ণরূপে ভরসা করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ
سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

"তোমরা আমাকেই ডাকো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। নিশ্চয়ই অহংকার-অহমিকার বশে যারা আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে শীঘ্রই তারা লজ্জিত-অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"–সূরা মু'মিন ঃ ৬০

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

"আর একমাত্র আল্লাহরই উপর তোমরা ভরসা স্থাপন করো যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক।"–সূরা মায়িদা ঃ ২৩

www.amarboi.org

বিশ্বাসীদের জন্য প্রতিটি কাজ ও প্রত্যেক দোয়াই ইবাদাত এবং প্রত্যেক ইবাদাতই দোয়া। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদাত ভিন্ন অর্থবোধক কিন্তু উভয় শব্দের মর্মার্থ এক। কেননা প্রত্যেক ইবাদাতের অর্ন্তনিহিত লক্ষ আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা বা ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা।

দোয়াতেও মানুষ পৃথিবীর কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী না থেকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে থাকে, তার করুণা কামনা করে এবং তার উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করে থাকে।

নবী মুহাম্মদ (স.) বলেছেন ঃ

"আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করো, কেননা আল্লাহ প্রার্থনা পছন্দ কবেন। অভাব-অনটনের সময় স্বচ্ছন্দতার জন্য দোয়া করা এবং রহমত প্রাপ্তির অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদাত।"

আমরা দোয়া-ইবাদাত করে থাকি। কিন্তু প্রায়শই ভাবি না যে, এসব দোয়া-ইবাদাত নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে কি না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসার ভক্তি তথা একাগ্রতা থাকা দরকার তা যদি আমাদের না থাকে তাহলে দোয়া ও ইবাদাত নিষ্ফল ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে। তাই দোয়া ও ইবাদাতের সময় আমাদেরকে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে ঃ

১. আমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং আমি তাঁর সৃষ্ট। শুধু আমাকে নয় বরং সমগ্র বিশ্বজগতে যাকিছু আছে সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন।

২. আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি নিজেই তাঁর অস্তিত্বের কারণ, বিশ্বজগতের সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ এতে কোনো প্রকার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নেই। তিনি স্বেচ্ছায় সবকিছু করে থাকেন। কোনো কাজে তার কোনো সাথী বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না।

৩. তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বিশ্বজগতের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। বিশ্বে যাকিছু ঘটে তার সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তিনি যা করতে ইচ্ছা করেন তাতে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বজগতে

www.amarboi.org

যাকিছু আছে, ছিল বা হবে, সবকিছুই তাঁর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন।

৪. আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি যেমন সবকিছু জানেন, তেমনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন। তাঁর সৃষ্টি যেমন কোনো প্রকার যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়, তেমনি তাঁর বোধশক্তি কোনো চেষ্টা ও চিন্তালব্ধ নয়। তাঁর জ্ঞান, দর্শন ও শ্রবণ সব একই সাথে একইভাবে ঘটে থাকে। তিনি যেমন পিপীলিকার পদধ্বনি শুনে থাকেন, তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, অণু-পরমাণু তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই।

৫. আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ বিশ্বজগতকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি জড়জগত বা ইহকাল এবং অন্যটি আত্মিক জগত বা পরকাল। মহান আল্লাহ ইহকালে প্রত্যেক মানুষের অবস্থানকাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ নির্ধারিত সময়ের কোনো কম বা বেশী হতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর স্বাদ মানুষকে আস্বাদন করতে হবে। দেহ থেকে প্রাণ প্রদীপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ বিচারের দিন প্রত্যেকের আবার প্রাণ সঞ্চার করা হবে। প্রত্যেককে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৬. আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর বাণী সত্য। যিনি পুরস্কার প্রদানের যে ওয়াদা ও শাস্তি প্রদানের যে ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

৭. আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কতে হবে যে, কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং আরো যতো "কিতাব" তিনি অবতীর্ণ করেছেন সবই আল্লাহর বাণী।

৮. আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, নবী মুহাম্মদ স. সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁর নবুওয়াতকে আল্লাহ পূর্ণতা দান করেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোনো নবীর আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

মানব জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হচ্ছে ইবাদাত। কেননা মৃত্যুর পর মানুষের সম্পর্ক থাকবে শুধু আল্লাহর সাথে। ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সখ্যতাসৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম। আমরা যতবেশী ইবাদাতে মনোযোগী হতে সক্ষম হবো ততবেশী নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হবো। প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেই একাগ্রচিত্ততা বৃদ্ধি পেয়ে

www.amarboi.org

থাকে। আমরা যদি একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে মগ্ন হতে পারি তাহলে সকল পাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারবো।

অতএব নিজেদেরকে পাপ মুক্ত রাখার জন্য এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর ইবাদাত ও যিকির করা বিশ্বাসীদের প্রধানতম কাজ। যারা এ কাজে যতবেশী সফল হবেন তাঁরাই সৌভাগ্যের অধিকারী এবং মুক্তির পথপ্রাপ্ত।

আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব কাজ করে থাকি সেগুলোও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে যদি শরীয়তের অনুশাসন ও সীমারেখার মধ্যে তা করা হয়। আল্লাহ মানুষের কর্তব্য ও অকর্তব্যের মাঝে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই বলা হয় শরীয়ত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়কে নির্ধারণ করার জন্য যেসব মাপকাঠি বা সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা মেনে চলা বিশ্বাসীদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মহান আল্লাহ ও নবী মুহাম্মদ স.-এর নির্ধারিত এ সীমারেখা লংঘনের, পরিবর্তনের আর প্রয়োজন হবে না বিধায় ইসলামের অনুসারীদেরকে অবশ্যই ইসলামের শরীয়তের পায়রুবী করতে হবে। শরীয়তকে অস্বীকার করে কিংবা তার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে মানুষের পক্ষে প্রকৃত ইবাদাত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা বিবিধ বিভ্রান্তির কারণে শরীয়তের সীমারেখা মেনে চলতে ও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে থাকি। এর ফলে আমাদের জীবনে আজ এতো বিশৃংখলা ও অশান্তি।

যারা অবিশ্বাসী তারা স্বাভাবিকভাবেই শরীয়তকে অস্বীকার করে থাকে। তাদের নিকট শরীয়তের কোনো মূল্য নেই কারণ তারা সৃষ্টিকর্তা কিংবা পরকালে বিশ্বাস রাখে না। কিন্তু এর বিপরীতে যারা নিজেদেরকে বিশ্বাসীরূপে এবং নবী মুহাম্মদ স.-এর উম্মতরূপে নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরেন, তাদের কেউ কেউ যুক্তি দেখান এই যে, ইবাদাতে আল্লাহর কি লাভ ? তিনি কি আমাদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী ? একথা সত্য যে, মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদাত না করে তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না বরং মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ইবাদাতের মধ্যে যিনি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হন তিনি নিজের কল্যাণের জন্যই তা অর্জন করেন। তারা আল্লাহর নিকট নিষ্পাপ ও নিরোগ আত্মা নিয়ে যেতে পারেন তারা ছাড়া অন্য কেউই মুক্তি পেতে পারেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করলে যেমন রোগী নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে যদি না সে আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী প্রদর্শিত শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে না চলে।

www.amarboi.org

আল্লাহর ইবাদাত না করলে বান্দাহ্ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ۔

"যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে।"–সূরা ফাতির ঃ ১৮

কেউ কেউ আবার এই বলে যুক্তি দেখান যে, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুর তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া স্রেফ বোকামি। এ যুক্তি আত্মপ্রতারণার সামিল। কেননা সর্বোত্তম খাবার খেতে আমরা অনেকেই পাই না। কিন্তু তাই বলে আমরা না খেয়ে থাকি না বা যথাসম্ভব অর্জন ও পূরণ থেকে কেউই বিরত থাকি না। শুধুমাত্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা সর্বোত্তম গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব। ক্রোধ, লোভকে বশীভূত করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। পৃথিবীতে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। রিপুর তাড়নাকে অবদমিত করে সত্য ও সুন্দর জীবনে ব্রতী হওয়ার মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব।

শরীয়তের বিধি-নিষেধ না মানার ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করি যা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন ও অন্তসারশূন্য। যেমন কেউ কেউ ভাবেন যে, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। শরীয়তের বিধি-নিষেধ হুবহু মেনে চলাও সম্ভব নয়। তাছাড়া আল্লাহ যেহেতু অত্যন্ত ক্ষমাশীল সেহেতু সকল পাপ তিনি মার্জনা করে দেবেন। এ ধরনের যুক্তি তারাই প্রদর্শন করে প্রকৃত অর্থে যারা প্রবৃত্তির দাসত্বকে আল্লাহর দাসত্বের চেয়ে শ্রেয়তর মনে করে থাকে। বস্তুত এদের হৃদয়ে মরিচা পড়ে গেছে। ফলে প্রকৃত সত্য হৃদয়ঙ্গম করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

মানবজীবনে প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবীতে মানুষের সর্বোত্তম অর্জন হচ্ছে পরকালের জন্য পূর্ণ সঞ্চয়। পার্থিব লালসা ও ভোগে মত্ত হয়ে মানুষ যখন পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে তখন সে নিশ্চিতভাবে আত্মহননের পথে অগ্রসর হয়। পার্থিব কামনা-বাসনা তাকে পরকালের বিষয়ে চিন্তার অবকাশ দেয় না। পরকালের কঠোর শাস্তির প্রতি যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার পক্ষে শরীয়তের বিধি লংঘনের জন্য যুক্তি উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। অতএব একজন প্রকৃত বিশ্বাসী আল্লাহর বিধি-বিধান না মেনে চলার পেছনে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেন না। বিশ্বাসীদের মনে প্রাণে সদাসর্বদা একই চিন্তা যে, কিভাবে সে সঠিক পথে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য সবসময় প্রার্থনা করেন ঃ

www.amarboi.org

إياك نعبد وإياك نستعين ○ اهدنا الصراط المستقيم ○ صراط
الذين أنعمت عليهم ۙ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ○

"হে প্রভূ! আমরা তোমারই ইবাদাত করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থী। আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো। তাঁদের পথ আমাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথ নয়, যাদের তুমি অভিশাপ দিয়েছো। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"–সূরা ফাতিহা ঃ ৩-৭

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও সুখ

সুখ নামক সোনার হরিণের পেছনে আমরা নিরন্তর ছুটে চলেছি। কিন্তু জীবনে কতজন প্রকৃত সুখীর সন্ধান আমরা পেয়েছি ? ধনী, দরিদ্র, নির্বিশেষে কোনো মানুষই তৃপ্ত নয়। সুখ যেন এক অলীক কল্পনা। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেও সুখ পাখিটির নাগাম আমরা পাই না। কোনো না কোনো দিকে মানুষের অপূর্ণতা রয়েই যায়। কিন্তু কেন এ অপূর্ণতা বোধ ?

বিশ্বাস তথা গভীর বিশ্বাসের অভাবেই মানুষ ইহকালীন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার মনে যে অশান্তি ও অতৃপ্তির প্রবণতা তার মূল কারণ প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাসের অভাব বলতে আমরা যা বুঝাতে চাই তাহলো এই যে, প্রকৃত বিশ্বাসী হতে হলে একজন মানুষের যেসব গুণাবলী অর্জন করতে হয়, আমাদের মধ্যে তার তীব্র অভাব রয়েছে। আমাদের চারিত্রিক অপূর্ণতা আছে বলেই আমাদের মানসিক অসন্তোষ থেকে যায়। অসন্তোষ থেকে সৃষ্টি হয় অশান্তি ও অসুখ। সুখের অভাবজনিত যে অসুখ তা নিতান্ত একটি মানসিক সমস্যা। কেননা সুখ কখনো ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা নির্ভর নয়। মানুষ অসুখী হয় তখনই যখন তার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আবেগ ও তার অফুরন্ত চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সে ব্যর্থ হয়।

ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ বা লোভ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সীমাহীন চাহিদার লোভ হতে মানুষ যদি নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে সে জীবনে সুখী হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ গতানুগতিকতার অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। ফলে সমাজের সবাই এক অদ্ভূত প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে পড়ে। এদের মাঝে প্রবলভাবে একটি মনোভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকর থাকে যে, কিভাবে অন্যের চাইতে সে নিজে আরো বেশী ধন-সম্পদ অর্জনে সক্ষম হবে। যখন সে দেখে যে, অন্যজন তার চেয়ে অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী তখন সে অসুস্থ ও অসুখী হয়। এটি এমন এক অদ্ভূত প্রতিযোগিতা যেখানে কেউ কখনো পরিপূর্ণ সফলতা ও সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

সমাজে আমরা সবসময় লক্ষ করি যে, নিজের চেয়েও অন্য জনের ধন-সম্পদ কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বা মান-সম্মান, ক্ষমতা ইত্যাদি বেশী রয়েছে। অতএব সে এসব অর্জনের মাধ্যমে সুখ নামক সোনার হরিণের

www.amarboi.org

পেছনে আজীবন কঠোর পরিশ্রম করতে করতে ইহকাল ত্যাগ করে। লোভের মতো আত্মধ্বংসী রোগ হতে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে শুধুমাত্র আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত চালিকা শক্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল আস্থা এবং গভীরতম বিশ্বাস। আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসের মধ্যেই মানুষ তার নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয় এবং জীবনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "একজন লোভী ব্যক্তি সাত প্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় ঃ

ক. দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা—যা তার দেহের ক্ষতিসাধন করে এবং যা তার জীবনের জন্য ক্ষতিকর।

খ. বিষণ্নতা—যার শেষ নেই।

গ. ক্লান্তি—যা হতে মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাণ এবং ঐ পরিত্রাণের সংগে লোভীরা আরো অধিক ক্লান্তিতে পৌছে যায়।

ঘ. ভীতি—যা অহেতুকভাবে তার জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

ঙ. দুঃখ—যা নেহায়েত অপ্রয়োজনে তার জীবনে বিশৃংখলা ঘটায়।

চ. বিচার—যা আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা না করেন।

ছ. শাস্তি—যা হতে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় নেই।"

তিনি আরো বলেছেন, "লোভ হতে বিরত থাক, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনেকেই লোভের কারণে ধ্বংস হয়েছে। লোভ তাদেরকে কার্পণ্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী হতে বলেছে এবং তারা তাই করেছে। এটা তাদেরকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলেছে এবং তারা তাই করেছে। এটা তাদেরকে অপরাধ করতে বলেছে এবং তারা তাই পাপী হয়েছে।" বস্তুত "লোভ আত্মাকে অপবিত্র করে, ধর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং যৌবনকে ধ্বংস করে।"–হযরত আলী রা.

লোভের সাথে সম্পৃক্ত আরো দুটি প্রবণতা মানুষকে সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত করে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেয়। এ দু'টি প্রবণতার মধ্যে একটি হচ্ছে কৃপণতা ও অন্যটি হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ স. কৃপণ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, "কৃপণ ব্যক্তিরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অসামাজিক"; তিনি আরো বলেছেন, "কৃপণতা পরিহার করো, কেননা কৃপণতা এমন লোক সৃষ্টি করেছে যারা তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়েছে এবং নিজেদেরকে রক্তপাতের

www.amarboi.org

দিকে ও পবিত্রতাকে লংঘন করার দিকে পরিচালিত করেছে।" কৃপণতা এমন একটি বদস্বভাব যা মানুষকে নৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে সংকীর্ণমনতার দিকে পরিচালিত করে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে অধিক কৃপণ হয়ে থাকে। সম্পদের প্রতি লোভ থেকেই তাদের মধ্যে আরো সম্পদের অধিকারী হবার আশায় তারা কৃপণতাকে অবলম্বন করে থাকে। এদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী ক্রমশঃ লুপ্ত হতে থাকে এবং এরা অর্থ ও সম্পদ তৈরীর এক একটি যন্ত্ররূপে নিজেদের পরিণত করে। তবে যন্ত্রের মতো এর যন্ত্রণামুক্ত নয়। পরশ্রীকাতরতা ও লোভ তাদের হৃদয়কে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। মানসিক অতৃপ্তিবোধ তাদের নিত্য সাথী হয়ে থাকে। তারা সবসময় মনে করে অন্যদের নিকট তারা পরাজিত হয়ে চলেছে।

আমরা যদি পরশ্রীকাতরতা ও লোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে সীমাহীন আশা-আকাংখার হাতে বন্দী হয়ে যাই তাহলে আমরা স্বভাবতই নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বো এবং জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা হেরে যাব। পরাজয়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়ন। জীবনে সুখ লাভের জন্য প্রধানতম প্রয়োজন হচ্ছে আত্মিক দৃঢ়তা।

সুখী জীবনের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা ও মনের শান্তি। আমাদের দায়িত্ব যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততোই আমাদের মধ্যে বেশী প্রয়োজন হয় মানসিক দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততার। লোভ দ্বারা সৃষ্ট পরাজয় ও হতাশাগ্রস্ত জীবনের বিপরীতে পরিচ্ছন্ন মননশীলতা হচ্ছে মানব উন্নয়নের এক প্রচণ্ড চালিকা শক্তি যা মানুষকে বস্তুগত লোভের বিপরীতে নির্লোভী হতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ তখন অন্যকে তার শত্রু ও প্রতিযোগী মনে করে না। বরং সমাজের সবার প্রতি আস্থাশীলতা তাকে করে তোলে ভীষণভাবে আশাবাদী।

বিশ্বাস ও আশা মানুষকে করে তোলে সদা কর্মচঞ্চল। আশাবাদিতা মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থাশীলতার সৃষ্টি করে। পারস্পরিক আস্থাশীলতা মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসার সৃষ্টি করে। হযরত আলী রা. বলেছেন, "আস্থা হচ্ছে অন্তরের শান্তি ও ঈমানের নিরাপত্তা।" আশাবাদীরা কখনো বিনয়, সংযম ও ধৈর্যের সীমালংঘন করে না। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী ও নৈরাশ্যবাদী তারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে। অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। আশা হচ্ছে আলো আর হতাশা হচ্ছে অন্ধকার। যেমন, বিশ্বাস আলো এবং কুফরী অন্ধকার।

www.amarboi.org

যার অন্তরের আয়না নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত সে সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে না। সে সৃষ্টিকর্তাকেও চিনতে পারে না।

পারস্পরিক আস্থাশীলতার অভাব যেমন আমাদের অনেক সামাজিক অশান্তি ও সমস্যার কারণ, তেমনি মিথ্যাবাদিতা, কপটতা ও আন্তরিকতার অভাব মানুষ হিসেবে আমাদের দৈন্যতাকে ফুটিয়ে তোলে। মানুষ যখন মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন সেখানে কপটতার প্রকাশ ঘটে। বস্তুত কপট লোকেরা তোষামোদকারী এবং অন্যদের বদনামকারী। নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণ থাকে ঃ

ক. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে,

খ. যখন কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তারা তা রক্ষা করে না,

গ. যখন তাদের কাছে কোনো আমানত গচ্ছিত রাখা হয় তারা তার খেয়ানত করে।

এছাড়াও আমরা লক্ষ করি যে, মিথ্যাবাদীগণ অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে থাকে। নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন, "একজন মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।"

অপবাদ রটনা ও পরনিন্দা করা এক ধরনের মানসিক রোগ। হিংসা, রাগ, আত্মগর্ব ও অবিশ্বাস থেকে এর জন্ম। নিজের পরাজয় বা দুর্বলতা ঢাকার জন্যও আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যের উপর দোষ চাপাতে থাকি। আমরা অন্যের দোষ খুঁজতে সদা তৎপর কিন্তু নিজেদের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তার প্রতি উদাসীন। অনেকে মনে করেন যে, অন্যকে খাটো প্রমাণ করতে পারলে নিজেকে বড় হিসেবে জাহির করা সম্ভব হবে। অতএব অহেতুক অপবাদ ও মিথ্যা রটনার দ্বারা মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রবণতা মানুষের মনস্তাত্বিক ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক। কেউ কেউ এসবের দ্বারা সাময়িক ও আপাত ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সে তার নিজের আত্মিক ক্ষতি সাধন করে থাকে।

অপবাদ রটানো একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং সামাজিক নীতি-নৈতিকতা বিরোধী। যেহেতু বিশ্বাসীদের আচার-আচরণের উৎস হচ্ছে তার ঈমান, সেহেতু মানুষ যখন এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তখন তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের পক্ষে এ ধরনের নীতি-নৈতিকতা বহির্ভূত কোনো আচরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ বিশ্বাসীগণ জানেন যে, তার প্রতিটি কাজ আল্লাহ দেখেন ও জানেন। মিথ্যা অপবাদ রটানোকে নিবৃত্ত করার জন্য নবী মুহাম্মদ স. বলেন, "তোমার উপস্থিতিতে যদি কারো

www.amarboi.org

বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আনা হয় তখন তুমি লোকটির সাহায্যকারী হও। অপবাদ রটনাকারীকে ঘৃণা করো এবং ঐ দলকে পরিত্যাগ করো।" তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাই-এর অবর্তমানে তার সম্মান রক্ষা করবে, তখন আল্লাহর উপর তার অধিকার হয়ে যাবে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবার।" এভাবে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য মিথ্যা অপবাদের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করাকে তাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের জীবনে সুখের প্রধানতম বাধা এবং নিকৃষ্টতম শত্রু হচ্ছে অহমিকা ও সন্দেহ প্রবণতা। অহমিকার অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে সন্দেহ, হতাশা ও অতিশয় সন্দেহপ্রবণতা। অতিশয় সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি সবসময় মনে করতে থাকে যে, অন্য সব লোকেরা তার ক্ষতি করতে চায় এবং সে সন্দেহ ও হতাশার আগুনে জ্বলতে থাকে। অহমিকাকারী ব্যক্তিরা তাদের দুর্বলতাসমূহকে সৎগুণ এবং ত্রুটিসমূহকে প্রশংসনীয় গুণ মনে করে। যেমন অন্যদের সাথে হঠাৎ রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারকে তারা তাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বলে মনে করে।

বস্তুত অহমিকা মানুষের শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। অহমিকা মানুষের মনকে দুর্বল করে ফেলে এবং অতিশয় আত্মাভিমানী লোকেরা মানসিক দুর্বলতা ভোগ করে। যখন মন দুর্বল হয়ে যায় তখন তার অহংকার আরো বেড়ে যায়। এসব লোকেরা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, তাদের নিজেদের মধ্যে দোষত্রুটি রয়েছে এবং অন্যরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী। অন্যরা যে তার চাইতে অনেক বেশী যোগ্যতার ও সম্মানের অধিকারী এ উপলব্ধি তাদের মনে থাকে না ফলে তারা অকৃতকার্য ও অসুখী হয়ে থাকে। অসুখী লোকেরা যদি সুখী হতে চায় তবে অবশ্যই তাদেরকে এ রোগ হতে মুক্ত হতে হবে। এ রোগ হতে মুক্তি পাবার প্রকৃত উপায় হচ্ছে বিনয় ও ভালবাসার দ্বারা মানুষের আস্থা অর্জন।

উন্নত আচার-আচরণের অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নত করে থাকে। বিনয় হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়ী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ও উন্নত বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

"ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে মানুষের কাছ থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না, গর্ব ও অংহকারের সাথে দুনিয়াতে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় আত্মাভিমানী লোকদের পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮

www.amarboi.org

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন, “অহমিকা পরিহার করো, কেননা একজন আল্লাহর আবেদ অহমিকার উপর জিদ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, তার নাম ঔদ্ধত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করো।”

মানব জীবনে সুখের সবচেয়ে প্রধান উপাদান হচ্ছে নিজের যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করা। মানুষ যখন তার চিন্তার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে শাণিত করতে সক্ষম হয় তখনই সে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হতে সক্ষম হয়। আমাদেরকে পৃথিবীতে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন এ পূর্ণতা অর্জনের জন্য। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে অবশ্যই সর্বোত্তম আচার-আচরণের সাহায্যে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি করা সম্ভব তখনই যখন আমরা সৎ, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের সুখের পথকে সুগম করে দেয়। সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব যখন মানুষ তার নিজের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। নিজের যোগ্যতা ও মর্যাদার প্রতি যার আস্থা নেই সে অন্যায় আচরণের দ্বারা, বিকৃতি ও নৈতিকতা বহির্ভূত কাজের দ্বারা নিজের মর্যাদাকে খাটো করে তার পক্ষে কখনোই সুখী হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ যদি তার নিজের মূল্যই বুঝতে না পারে তার পক্ষে উত্তম আচরণের অধিকারী হওয়া বা সৎ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। মানুষ যদি সুখী হতে চায় তবে তাকে অবশ্যই নীতিবান হতে হবে। যদি মানুষের ঈমান বা বিশ্বাস না থাকে তবে সে নীতি-নৈতিকতার অনুসরণ করে না এবং উত্তম আচার-আচরণের অধিকারী হওয়ার সদিচ্ছাও তার থাকে না। উত্তম আচরণের অধিকারী হতে না পারলে মানুষ সুখী হতে পারে না।

মানুষ হিসেবে সবাই সমান। কিন্তু যে মানুষ পূর্ণতা অর্জনে যতটুকু অগ্রসর হতে পারে সে ততটুকু উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সর্বাধিক। ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মানুষের স্বীয় সম্ভাবনাসমূহকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তার পূর্ণতা অর্জনের পথে সমস্ত বাধাসমূহ অপসারিত হয়ে যায়। জীবনে পূর্ণতা অর্জনের বাধাসমূহ দূর করতে হলে মানুষকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কি ধরনের চারিত্রিক ত্রুটি তার নিজের মধ্যে রয়েছে। ত্রুটিসমূহ দূর করার পর তা দূর করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করা প্রয়োজন। শারিরীক অপূর্ণতার ক্ষেত্রে

www.amarboi.org

যেমন পুষ্টি ও ব্যায়াম প্রয়োজন, মানসিক পূর্ণতা অর্জনের জন্যও আমাদের প্রয়োজন আত্মার খোরাক ও মানসিক অনুশীলন। মানবীয় গুণাবলী অর্জন ও আত্মিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে না।

আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে অনেক চারিত্রিক ত্রুটি, যেমন— লোভ, কৃপণতা, ক্রোধ, অহমিকা, মিথ্যাবাদিতা, হতাশা ইত্যাদি। এসব ত্রুটি হতে আমরা মুক্ত হতে পারি শুধুমাত্র এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে যে, আল্লাহ্ হলেন সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী এবং আমরা তাঁর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে এক বৈপ্লবিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে থাকে। আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসমূহ যা আমার উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করবে তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় ও উত্তম আচরণ।" অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাস ভিত্তিক উত্তম আচরণ শুধু ইহকালীন সুখ ও শান্তির নিশ্চয়তা দেয় না বরং তা পরকালীন সর্বোত্তম পুরস্কারেরও নিশ্চয়তা প্রদান করে।

❒

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও সংগ্রাম

একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যই আজ আমরা মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের সত্যিকার চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের মাঝে নেই। ইসলাম আমাদের জন্য যে 'জীবনপদ্ধতি' দিয়েছে আমরা সে 'জীবনপদ্ধতির' প্রকৃত অনুসারীও নই। বস্তুত আমাদের অনেকের কোনো ধারণা নেই যে, ইসলামের জীবনপদ্ধতি বলতে কি বুঝানো হয়ে থাকে। বিষয়টি জানার ও বুঝবার জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমিত বা খুবই কম। এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, না জেনে, না বুঝে ইসলামের অনুসারী হওয়া যায় না। আবার ইসলামের অনুসারী হতে হলে মানুষকে স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে যে, ইসলামের মর্মকথা বা বিশ্বাসের মর্মবাণী সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অনবহিত। নবী মুহাম্মদ স.-এর একটি বাণী এ সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে—"বিশ্বাসের মর্ম সেই ব্যক্তি গ্রহণ করেছে, যে আল্লাহকে প্রভু ও প্রতিপালক হিসেবে, মুহাম্মদ স.-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং ইসলামকে নিজের জীবনপদ্ধতি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।"

যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, নবী মুহাম্মদ স.-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং ইসলামকে নিজের জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে নিজের সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছা, নবী স.-এর নির্দেশ ও ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী করে থাকেন। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী তার সকল কর্মকাণ্ডকে ইসলামের অধীন করে দেন এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন সবকিছু প্রত্যাখান করেন। নবী মুহাম্মদ স. স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমি যে হেদায়াত এনেছি যতক্ষণ না তোমাদের ইচ্ছা-বাসনা তার অধীন হয় ততোক্ষণ তোমাদের একজনও মুসলমান হতে পারবে না।" এ বক্তব্যের পরিষ্কার অর্থ এই যে, প্রকৃত মুসলমান হতে হলে তাকে অবশ্যই নবী মুহাম্মদ স.-এর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত জীবন বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে। একজন মুসলমান যখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হন, নবী মুহাম্মদ স.-কে একমাত্র নেতা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান রূপে গ্রহণ করেন তখন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, ইসলামের নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। সীমা অতিক্রম করা প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

ইসলামকে নিজের জীবনপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার পর জীবনের কোনো কর্মকাণ্ড যে কোনো পথে পরিচালিত করার কোনো অধিকার আর মুসলমানদের থাকে না। এরূপ করা হলে তা হবে মুনাফেকী। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুসলমানদের অবশ্য করণীয়। কিন্তু করণীয় এখানেই শেষ নয়। নবী মুহাম্মদ স.-কে একমাত্র নেতা হিসেবে গ্রহণ করলে নবী মুহাম্মদ স.-এর অনুসরণ করা জরুরী। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে। এ আদর্শ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে পাবার এবং আখেরাতে নাজাত লাভ করার আশা পোষণ করেন।"–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

(খ)

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

"আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যাকিছু দেন, তা গ্রহণ করো এবং যাকিছু থেকে দূরে থাকতে বলেন তার থেকে নিজেকে দূরে রাখ এবং ভয় করো আল্লাহকে, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"–সূরা হাশর ঃ ৭

নবী মুহাম্মদ স. এ ব্যাপারে নিজে বলেন, "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয় আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা পালন করবে। আর যেসব বিষয় থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলি, সেসব থেকে দূরে থাকবে।"–বুখারী ও মুসলিম

নবীর আদর্শ, তথা তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা বিশ্বাসীদের জন্য অতীব জরুরী। কারণ পবিত্র কুরআনে এ নির্দেশ মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে শুধু নবীর নির্দেশ মেনে চলার জন্য বলা হয়নি সেই সাথে পৃথিবীতে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ
وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

"তিনি তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ (হেদায়াত) এবং খাঁটি জীবনবিধান (দীনে হক) সহ পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূল সেই খাঁটি জীবন বিধানকে অন্যান্য সকল জীবনবিধানের উপর বিজয়ী করবেন—মুশরিকগণের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও।"

–সূরা আস সাফ ঃ ৯

ইসলামকে গ্রহণ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য, একটি জীবনবিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করা। নবী মুহাম্মদ স.-কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে "দীনে হক"-এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি বিশ্বাসীকে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একথা সত্য যে, বিশ্বাসীগণ এ প্রচেষ্টা নিয়ে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য। কিন্তু সেই সাথে এটিও সত্য যে, "খাঁটি জীবনবিধান" পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানব সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার দূর করা সম্ভব হবে। হানাহানি পূর্ণ পৃথিবীতে সম্প্রীতি, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য বিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত হিসেবে গণ্য। এ সংগ্রাম বিভিন্নভাবে হতে পারে। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য বক্তৃতা বা লেখনীর সাহায্যে এ প্রচেষ্টা নেয়া যায়। আবার নিজের সময়, শ্রম, শক্তি, ধন-সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমেও এ সংগ্রামে বিশ্বাসীগণ শরীক হতে পারেন। একটি আদর্শ জীবনব্যবস্থাকে সমাজে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা না নিয়ে সমাজ বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করা ইসলামের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ মুসলমানদের মূল লক্ষ হচ্ছে সমাজব্যবস্থাকে নূতনভাবে পুনর্গঠন করা। এ মহান উদ্দেশ্যে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য জরুরী কর্তব্য।

বিশ্বাসী মুসলমানরা জানেন যে, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স. ছিলেন এ সংগ্রামী কাফেলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা। মুসলমানরা এ বিপ্লবী নেতার অনুসারী হিসেবে সমাজের বুকে আল্লাহর জীবনবিধানকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ না করার ফলে

www.amarboi.org

আজকে সমাজ জীবনে কাংখিত পরিবর্তন আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থার সকল প্রকার বিপর্যয়মূলক নিয়ম-নীতির মূলোৎপাটন করে সেখানে পূর্ণাংগ সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সর্বাত্মক সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে তাই বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

"তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি, বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি তোমরা বিশ্বাসস্থাপন কর।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

"তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, যতদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, সামগ্রিক সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন করা মুসলমানদের চূড়ান্ত লক্ষ। যেহেতু ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল "জীবনবিধান" সেহেতু সমাজ জীবনে তা অসাধারণ ও অলৌকিক কোনো পন্থায় বাস্তবায়িত হয়ে যাবে বলে কেউ কেউ আশা পোষণ করেন। তারা মনে করেন আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করার মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে। এ আশা যদি সঠিক হতো তাহলে মহানবী স.-কে সংগ্রামের কঠিন পথ বেছে নিতে হতো না। আল্লাহ চান মানবজাতির জন্য প্রদত্ত জীবনবিধান মানুষের চেষ্টায় মানুষের শক্তি সামর্থের দ্বারা বাস্তবায়িত হোক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

"নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তা পরিবর্তিত করে।"–সূরা আর রাদ ঃ ১১

www.amarboi.org

আল্লাহ মানুষকে সফলতার সেই স্তরে পৌঁছে দেন যার জন্য সে চেষ্টা করে এবং যে পরিমাণ শক্তি সামর্থ সে প্রয়োগ করে।

আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান বাস্তবায়িত করা সম্ভব একদল সংগ্রামী বিশ্বাসীদের নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা। এসব বিশ্বাসীরা মনে প্রাণে একটি আদর্শ জীবনবিধানকে গ্রহণ করেন, নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করেন এবং সমাজ জীবনে একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এরা একদিকে যেমন নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামরত তেমনি আল্লাহর "জীবনবিধান"কে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে সকল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। এঁরা কখনো বিজয়ী হন কখনো পরাজিত হন। জয়-পরাজয় নির্ভর করে তাঁদের প্রচেষ্টা এবং যুগোপযোগী উপকরণের প্রয়োগ ও পরিমাণের উপর। ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসীরা আদর্শের অনুসরণ কতটুকু করেন ও আচার-আচরণে তার প্রতিফলনের কতটুকু পড়ে তার উপরও জয়-পরাজয় নির্ভরশীল হতে পারে।

জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য এক চরম বাস্তবতা। একজন বিশ্বাসী যখন নিজেকে সংগ্রামে নিয়োজিত করেন তখন তার চিন্তার পরিধি ও কর্মের দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। সংগ্রামরত একজন বিশ্বাসী মানুষ জীবনকে পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখেন ফলে তার চিন্তার জগত ও কর্মের উদ্দীপনা বেড়ে যায়। একজন নির্বিকার মানুষের মাঝে এসব আশা করা যায় না। তাই বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয় নিস্পৃহ ও অনিচ্ছুক মানুষকে ইসলামের পথে আনার জন্য। সমাজপতিদের বিরোধিতা, অনিচ্ছা ও অসহায়তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয় ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা উৎপাটনের জন্য। বিশ্বাসীদের এ সংগ্রাম যুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ, দুর্দশা, অত্যাচার, নিপীড়ন। বিশ্বাসীদেরকে তখন ধৈর্যধারণের ও বিপদ মোকাবেলার চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ সংগ্রামের পথে পদে পদে আছে বাধা। ফলে বিশ্বাসীদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ ও যন্ত্রণা। বিশ্বাসীদের জীবনের এ সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করার আমোঘ হাতিয়ার রূপে পরিণত হয়। পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

সমাজ-বিপ্লবের সফলতার জন্য বিশ্বাসীদেরকে অগ্নী পরীক্ষার সম্মুখীন করেন আল্লাহ। বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-যন্ত্রণার আঘাতে আঘাতে মুসলিম মিল্লাত পরিশুদ্ধ হতে থাকে। এরপর আল্লাহর সাহায্য যখন আসে তখন

www.amarboi.org

সমাজ-বিপ্লব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, "যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি তাদেরকে পথ দেখাই।" আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। কিন্তু সে সাহায্য পাওয়ার জন্য বিশ্বাসীদেরকে তাঁদের শক্তি-সামর্থ দিয়ে সংগ্রামে ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সমাজ-বিপ্লব সফলতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য তখনই আসে যখন বিশ্বাসীরা সে সাহায্য লাভের উপযুক্ততা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই সংগ্রামে রত থাকে।

মুসলমানদের সমাজে ইসলামের ধারক ও বাহক হিসেবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কর্মকাণ্ড সাধারণত ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এঁদের কোনো ভূমিকা নেই। সমাজের উপর এদের প্রভাব ক্রমশ বিলীন হতে চলেছে। অথচ ইসলামী হুকুম আহকাম সম্পর্কে এরা বেশী জানেন এবং ইসলামকে সমগ্র বিশ্বের বুকে নির্ভুল জীবনবিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সর্বাধিক জরুরী।

অবশ্যই এদের মধ্যে অনেক বুজর্গ আছেন যারা ইসলামকে তার পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে পুনরায় প্রবর্তিত দেখতে চান। কিন্তু তারা কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও ওয়াজ নছীহত করেই ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। সমাজে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের উপর এসব ওয়াজ-নছীহত তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্যদিকে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সংগ্রামের অদম্য মনোভাব ও শক্তি সামর্থের অভাব দেখা যায়।

অতএব প্রকৃত বিশ্বাসীদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষকে ইসলামের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল করা। ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি তীব্র তাকিদ রয়েছে। পারস্পরিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে জনগণ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। শত শত বছর সমাজের নেতৃত্ব প্রদানকারীগণ জনগণকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তারা মনে করেছেন ইসলাম নিরাপদে রয়েছে। ফলে মুসলমানরা আজ দীন ও দুনিয়া উভয়ই হারিয়েছে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা কোনো অলৌকিক ঘটনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সার্বিক গণচেতনা ও গণজাগরণ ছাড়া জীবনপদ্ধতিকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিশ্বাসীদেরকে দুঃখ-গঞ্জনা ভোগ করে, নির্যাতন

www.amarboi.org

ও নিষ্পেষণ সহ্য করে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আদর্শের দৃঢ়তা প্রমাণ করতে হবে। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বাসীগণ এমন নিখাদ সোনায় পরিণত হন যে, তাঁদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজে তার প্রমাণ মিলে। বিশ্বাসীদেরকে এমন চরিত্রের অধিকারী হতে হয় যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁরা নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, ত্যাগী, আদর্শবাদী ও আল্লাহভীরু। মানুষ যেন বুঝতে সক্ষম হয় যে, বিশ্বাসীরা যে জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবতার কল্যাণ, সুবিচার ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

ইসলামের সমাজ বিপ্লব তখনই সংঘটিত হতে পারে যখন এর জন্য ব্যাপক গণ-জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং জাগ্রত জনতার নেতা ও প্রতিনিধিরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হন। নবী মুহাম্মদ স. যখন ইসলামী জীবনব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছিলেন তখনও তার জন্য এবং তার অনুসারীদের জন্য ছিল এক কঠিন অগ্নী-পরীক্ষার সময়। প্রথম তের বছরে মাত্র তিনশত বিশ্বাসী তৈরী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী মাত্র দশ বছরে সমগ্র আরবে তাঁর প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমাজ-বিপ্লবের সফলতার জন্য সংগ্রাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। অনমনীয় ও দুর্বার সংগ্রামী বিশ্বাসী মুসলমানদের পক্ষেই শুধু আল্লাহর জীবনবিধানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী এবং আর্দশে বলীয়ান হওয়া ছাড়া সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বিশ্বাসীদের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শের তথা সত্য ও সুন্দরের বিজয় যারা দেখতে চান, তাদেরকে অবশ্যই মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে সাহসী ও সংগ্রামী হতে হবে।

❐

www.amarboi.org

জ্ঞান ও বিশ্বাসের গভীরতা

জ্ঞান ও বিশ্বাস পরস্পরের সম্পূরক। প্রকৃত বিশ্বাসী হতে হলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন ব্যতিরেকে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা না হলে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়। একজন বিধর্মী কিংবা অবিশ্বাসীর সংগে একজন বিশ্বাসী মুসলমানের মূল পার্থক্য হচ্ছে তাদের জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রয়োগ। একজন অবিশ্বাসী আল্লাহকে মানে না বা অস্বীকার করে শুধুমাত্র এজন্য যে, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকার ফলেই একজন মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। একইভাবে, মুসলমানদের মধ্যে যারা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না অথবা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক তথা সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে না তাদেরকে প্রকৃত বিশ্বাসী বলা যায় না। শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং সে কারণে আরবী ভাষায় নামকরণের কারণে আমরা প্রকৃত মুসলিম বা প্রকৃত বিশ্বাসী হবার দাবি করতে পারি না।

জ্ঞানের সাথে অজ্ঞানতার, আলোর সাথে অন্ধকারের তথা ইসলামের সাথে কুফরীর পার্থক্য যারা নির্ণয়ে অক্ষম তারা সত্যিকার অর্থে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে পদে পদে মানুষের পদস্খলন ঘটে, পথ হারাবার আশংকা থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানের অভাব আমাদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছে। জ্ঞানের অভাবেই আমরা সহজ, সরল ও মধ্যপন্থা অবলম্বন না করে চরম পন্থার অনুসারী হয়ে পড়েছি। আমরা সেই পথ অনুসরণ করছি যা বাঁকা, গরল এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে তাদের অজ্ঞানতা। নিজের সম্পর্কে, নিজের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আমাদের চরম উদাসীনতা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। মুসলমানদের এ দুর্বলতার ফলেই নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মুসলমানদের আজ এত দুর্দশা ও হতাশা। আমাদের বিশ্বাসের ভিত দুর্বল বলেই আমরা দিশেহারা। অথচ সমগ্র বিশ্বমানবতাকে সঠিক ও সরল পথের দিশা দেখাবার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। একজন প্রকৃত মুসলমান হতে হলে তাকে প্রকৃত বিশ্বাসী হতে হবে। একজন অবিশ্বাসী যেমন ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে পারে না,

১৩—

www.amarboi.org

তেমনি প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতিরেকে প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত মুসলমানরা শেষ বিচারের দিনে পুরস্কৃত হবে এবং অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের আগুনে কালাতিপাত করবে।

অবিশ্বাসীদের কেন সৃষ্টিকর্তা এতো বেশী শাস্তি দিবেন তা উপলব্ধি করা আমাদের প্রয়োজন। একজন কাফির, মুশরিকের সাথে মুসলমানদের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তাদের হৃদয়ের বিশ্বাস এবং জীবনাচরণ। ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। অবিশ্বাসীরা আল্লাহকে অস্বীকার করে। তাদের আনুগত্য শয়তানের উপর। অতএব চরম শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত যারা অবাধ্য, যারা অসত্যের অনুসারী, যারা অনুগত নয়। আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে জানলেই মুসলমান হওয়া যায় না। আল্লাহকে অবশ্যই জানতে হবে এবং সেই সাথে মানতে হবে তার সব হুকুম আহকাম। জ্ঞানের সাথে জীবনাচরণের যদি মিল না থাকে তবে সে জ্ঞান নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। একজন বিশ্বাসীর সাথে অবিশ্বাসীর, একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের এবং একজন মুসলমানের সাথে অন্য একজন মুসলমানের পার্থক্য নিরূপিত হয় তার জ্ঞান এবং তার কর্মের দ্বারা। মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান হবেন তিনি যার কথা ও কাজ এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিনি ব্যয় করেছেন সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশ অনুসারে। যিনি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তার নির্দেশ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করেছেন তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

প্রকৃত বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আল কুরআন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানরা এ মহাগ্রন্থকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা মনে করেছে এ মহাগ্রন্থ শুধুমাত্র দোয়া, তাবিজ, ঝাড়, ফুঁকের জন্য ব্যবহারযোগ্য। কারো কারো মনে এ মহাগ্রন্থের জন্য রয়েছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। কিন্তু কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার সৌভাগ্য এদের হয়নি। অনেকের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন শুধুমাত্র গল্প, কাহিনী বা কিছু আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশ বাণীর সমষ্টি মাত্র। মহাজ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে কুরআনকে স্বীকৃতি দিতে আমরা অনেকেই কুণ্ঠিত।

মানবতার মুক্তির সনদ রূপে আল কুরআনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারার কারণেই মুসলমানরা আজ প্রকৃত মানব কল্যাণের নিশান বরদার হতে ব্যর্থ হয়েছে, এ বোধটুকুও আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল নয়। ফলে এ মহাগ্রন্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা যেমন ব্যর্থ হয়েছি, তেমনি ব্যর্থ

www.amarboi.org

হয়েছি এ জ্ঞান ভাণ্ডার হতে উপকৃত হতে। মহান আল্লাহ যে গ্রন্থ নাযিল করেছেন মানুষের প্রকৃত কল্যাণের জন্য, সে গ্রন্থের অনুসারীরা পৃথিবীতে নিরন্তর, নিগৃহীত, নিপীড়িত হচ্ছে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করেছে। আমাদের চিন্তায়-চেতনায়, চলনে-বলনে, শিক্ষা ও আদর্শে যদি আমরা মুসলমান ও অমুসলমানদের পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হই তবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাথে অন্যদের কোনো তফাত থাকে না। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হবার দাবি করাও আমাদের জন্য হাস্যকর।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হবার জন্য আমাদের কি করণীয়, কি বর্জনীয়, কি গ্রহণীয়, কি পালনীয় তা যদি পরিষ্কার না হয় ; মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা যদি আমরা বুঝতে অক্ষম হই, তবে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মুসলিম বা প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়। ইসলাম অর্থ আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ তথা তার দেয়া জীবনবিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের পক্ষে মুসলিম হওয়া সম্ভব। আল্লাহ মহানবী স.-এর মাধ্যমে যে জীবনবিধান আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন সেই আল কুরআনকে জানা, তার মর্ম উপলব্ধি করা এবং তা মেনে চলা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত।

কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে মনে, মগজে কুরআনের জীবনদর্শনের বিপরীত কোনো চিন্তা ঠাঁই পেতে পারে না। কুরআনের জীবনদর্শন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কুরআনকে জীবনের চলার পথের একমাত্র নির্দেশিকা বা আলোকবর্তিকা হিসেবে মেনে নেয়ার পর আল কুরআনের আদর্শ তথা মহানবী মুহম্মদ স. প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এর অন্যথা হলে মুসলমানরা আত্ম-প্রতারণার দ্বারা নিজেদের ধ্বংসকে তরান্বিত করবে মাত্র।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রকাশের নাম ঈমান। কালেমা উচ্চারণের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকার পালনের শপথ করা হয়। "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল" এ বাক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশ্বাসের পরিপূর্ণ বীজ। শুধু মুখে কতিপয় শব্দ উচ্চারণের অর্থ ঈমান নয়। ঈমান হচ্ছে অঙ্গীকার বা শপথ। মুসলমানরা কালেমা উচ্চারণের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করেন যে, এ পৃথিবীর এবং সমগ্র বিশ্ব চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি তাঁর প্রদত্ত

www.amarboi.org

আইন বা জীবনবিধান ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান অনুসরণ করা যাবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র এবং রাসূল স.-এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা মুসলমান হবার জন্য প্রধানতম করণীয় কর্তব্য।

নবী মুহাম্মদ স.-কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতা হিসেবে মানা জরুরী, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন একটি অনুসরণীয় আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাচরণের মাপকাঠি। ভালো ও মন্দের পার্থক্যসমূহ তিনি নিরূপণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে নবীর আদর্শ অনুসরণ করা যেমন জরুরী, তেমনি জরুরী রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে আল্লাহ্ ও রাসূল নির্দেশিত জীবন-ব্যবস্থার প্রচলন। আল্লাহ্র আইন তথা জীবনবিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন কারণ আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের মালিক। মালিকের হুকুম অনুসরণ করা তাঁর সৃষ্ট বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক। তদুপরি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুসরণের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা হচ্ছে একটি মহান সত্যের স্বীকৃতি। এ সত্য চিরন্তন। কালেমা তাইয়্যেবা একটি জ্ঞানের বীজ। এ বীজ হতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে হৃদয়ের গভীরে এক মহাসত্য। সত্য জ্ঞান মানব হৃদয়ে যতবেশী ফুলে- ফলে সুশোভিত হতে থাকে ততবেশী সৎকর্ম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়। হৃদয়ের গভীরে মহান আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে কর্ম জীবনে এর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব না হলে বুঝতে হবে আমাদের বিশ্বাসে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের সরল অর্থ এই যে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে। মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশের বরখেলাপ কোনো কিছু করবে না। তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, অসহায় অবস্থায় পিতৃ-মাতৃস্নেহে শৈশব ও বাল্যকালে বড় হয়ে ওঠার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন, পৃথিবীতে দিয়েছেন অজস্র নেয়ামত। আলো, বাতাস, পানি ও জীবন ধারণের সব উপকরণ তার সৃষ্টি।

সবকিছুকে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করার দায়িত্ব মানুষকে তিনি দিয়েছেন। মানুষকে তিনি বানিয়েছেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি রূপে। প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর হুকুম মেনে চলা এবং জীবনাদর্শ হিসেবে কুরআনকে গ্রহণ করা। মানুষ যদি তা গ্রহণ না করে তবে সে অবশ্যই

www.amarboi.org

অপরাধী হবে। মানবতার কল্যাণের জন্য যে জীবনবিধান তা গ্রহণ করা না হলে তা হবে বিদ্রোহের শামিল।

যারা কালেমার বীজকে হৃদয়ে গ্রহণ করে না কিংবা মনে-প্রাণে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না তাদের হৃদয়ে রোপিত হয়ে যায় কুফরী বা শয়তানের বীজ। তারা মনে করে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই অথবা সৃষ্টিকর্তা এক নয় একাধিক। যাদের মনে এ ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস থাকে তারা পৃথিবীকে তথা বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করে সৃষ্টি করতে চায় অরাজকতা, হানাহানি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ। সভ্যতা বিনাশী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় তারা মত্ত। নিজেরা অপরাধ করে এরা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকে তারা ঘৃণা করে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অপবাদ দেয়। শক্তির মদ-মত্ততায় তারা মনে করে যে, তাদের পক্ষে সম্ভব হবে সত্যকে পরাভূত করা। ন্যায়ের ও সত্যের বিপক্ষে শয়তানী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু একই সাথে বিশ্বাসীদের দৃঢ়তা ও মনোবলকে তারা ভয় পায়। অন্যদিকে সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে অসত্যের পরাজয় একদিন হবেই এ গভীর বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে প্রকৃত বিশ্বাসীরা কখনো পিছু হটে না। অন্যায়ের নিকট, শয়তানী শক্তির নিকট তারা মাথানত করে না।

বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর বাণী সত্য। একদিন সকল শয়তানী শক্তির পরাজয় ঘটবে এবং সত্যের বিজয় হবে। যারা সত্যের সাক্ষ্য দিবে, যারা সত্যের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার অবধারিত। বিশ্বাসীরা জানে তাদের শ্রম, তাদের সাধনা, তাদের সংগ্রামের, তাদের ত্যাগ, তিতীক্ষার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন কখনো ইহকালে, কখনো পরকালে কিংবা ইহকালে ও পরকালে।

যারা বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী তারা ইহকালে পুরস্কারের প্রত্যাশা করে না। বরং তারা অনন্ত পরকালের পুরস্কারের প্রত্যাশায় সত্যের সংগ্রামে হয়ে ওঠে দুর্নীবার। তাদের সাহস, উদ্যম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার দীপ্ত শপথ তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদার জন্য লালায়িত করে। পার্থিব কোনো চাওয়া-পাওয়া তাদেরকে বিপথগামী করতে পারে না। তারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে না। পার্থিব কোনো শক্তির দাপট বা প্রভাব তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না। তারা সত্যের পক্ষে অনঢ় এবং অজেয় থাকতে চান।

হতে পারে পৃথিবীতে এরা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু তাদের নিষ্ঠা, তাদের সততা, তাদের দৃঢ়তা তাদেরকে অমর করে রাখে। তারা আত্মপূজায় মগ্ন

www.amarboi.org

থাকে না। তারা নিবেদিত শুধু মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি। পার্থিব সকল লোভ-লালসার উর্ধে উঠে যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হন, তারাই শুধুমাত্র কামিয়াব হন। গভীরতম প্রত্যয় ও দৃঢ়তম বিশ্বাসের ফলে তারা মানবতার কল্যাণে আজীবন সংগ্রামরত থাকেন।

বিশ্বাসের গভীরতা যত িথীল ও দুর্বল হবে মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আমরা ততো গাফেল হয়ে পড়বো। আমাদের দায়িত্ব যদি হয় মানবতার কল্যাণ, তবে মানব কল্যাণের জন্য যে জীবনবিধান আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে ব্রতী হতে পারি। ইসলাম ধর্মের আংশিক অনুসরণের দ্বারা প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়। যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষে নিজের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন তারাই প্রকৃত ধর্মানুরাগী, তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী বা মু'মিন হিসেবে নাযাত পাবার আশা পোষণ করতে পারেন।

একজন ঈমানদার বা বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। কিন্তু এ আত্মসমর্পণ অর্থ এই নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহর কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বরং বিশ্ব-মানবতার কল্যাণের লক্ষেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। অতএব তার দেয়া বিধান মানবতার জন্য সর্বোত্তম ; এই বোধ ও বিশ্বাস আমাদেরকে পরিণত করবে সর্বোত্তম জাতিতে। বিশ্বাসের এ গভীরতা মানব মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

আমাদের বড় একটি অসামঞ্জস্যতা হচ্ছে এই যে, আমরা ইবাদাত বা উপাসনাকে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত না করে শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে থাকি। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য ইবাদাত বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুধু পুণ্যের কাজ নয়, বরং বিশ্বাসীর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি আদেশ, প্রতিটি উপদেশ ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে পারে যদি তা করা হয় হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য ও মানবতার কল্যাণের লক্ষে। একজন বিশ্বাসীর নামায, সিয়াম, সাধনা, তার যাকাত, হজ্জ্ব, জিহাদ এসব কিছুর লক্ষ মানবতার কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় শামিল হওয়া মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্যতম। জামাতবদ্ধ নামাযের জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বারংবার। কিন্তু নামায বা দলবদ্ধ প্রার্থনা বিশ্বাসীদের লক্ষ

www.amarboi.org

নয় বরং লক্ষে পৌঁছার মাধ্যম। আল্লাহ্ মানুষকে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ করেন। তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। অতএব শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার মধ্যে মুক্তি নিহিত নেই।

মানবতার কল্যাণের জন্য প্রতিনিয়ত হেদায়াত বা সঠিক পথপ্রদর্শনের প্রার্থনা করা হয় নামাযের মধ্যে। নামাযের মধ্যে একজন বিশ্বাসী নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট। নামাযে শপথ গ্রহণ করা হয় যেন একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হয় সত্য ও সুন্দরের লক্ষে। মহামানবগণ যেভাবে মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন, সেভাবে যেন নিজেদের গড়ে তোলা সম্ভব হয়, সে শক্তি প্রার্থনা করা হয়।

নামায, বিশ্বাসীদের অঙ্গীকার পূরণের জন্য দায়িত্ব পালনের জন্য সদা জাগ্রত থাকার সদা প্রস্তুত থাকার কসরৎ। নামাযের জন্য আহ্বান জানানোর সাথে সাথে সব কাজ ফেলে, দলবদ্ধ হয়ে এক লক্ষে, এক সাথে কাজ করার অঙ্গীকার পালন করা হয় নামাযের মধ্য দিয়ে। নামাযে পঠিত হয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী। এ বাণীসমূহ মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। এ বাণীসমূহে রয়েছে জ্ঞানের আলো যা মানুষকে আলোকিত ও উজ্জীবিত করে।

আমাদের নামায যদি আমাদেরকে সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয় তবে বুঝতে হবে আমাদের বিশ্বাসে গভীরতা নেই। লোক দেখানো নামাযে কোনো ফায়দা না হবারই কথা। ব্যক্তি চরিত্র গঠনে নামাযের রয়েছে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা। কিন্তু সমাজে আমরা লক্ষ করি নামায তার কাংখিত ভূমিকা পালনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ। এ ব্যর্থতা আমাদের যারা নামাযকে নিছক একটি আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নামাযের মাধ্যমে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে অভ্যস্থ হবার ব্যাপারে কোনো দিন যারা আগ্রহ প্রকাশ করেনি তাদের চরিত্রে নামাযের প্রভাব পড়বে না এটিই স্বাভাবিক।

ব্যক্তি চরিত্র গঠনের পাশাপাশি নামাযের মধ্যেও রয়েছে কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, চিন্তার ঐক্য, সামাজিক বন্ধন ও নেতৃত্বের বিকাশ নিয়মিত দলবদ্ধ নামায আদায়ের মাধ্যমে ঘটানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে মুসলমানদের নামাযের অনুষ্ঠানে সমসাময়িক সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমাধানের দিক কোনো নির্দেশনা পেশ করা হয় না। ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে সাপ্তাহিক নামায-

www.amarboi.org

সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাংখিত ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ বলে মনে হয়।

নামাযের মৌল লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই মুসলমানরা আজ সমাজ গঠনে তাদের প্রার্থনার অনুষ্ঠানসমূহকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু নামায নয় ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হিসেবে যেগুলো গণ্য যেমন—সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সবকিছুই কাংখিত লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে কারণ এসব অনুষ্ঠান নিষ্প্রাণ ও নিষ্ফল উৎসব কিংবা স্রেফ বাহ্যিক আচার হিসেবে পালিত হচ্ছে। সিয়াম-সাধনার দীর্ঘ এক মাস দিবা রাত্রির প্রশিক্ষণ, বিত্তশালীদের যাকাত প্রদান, হজ্জ পালন, কিংবা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ কোনোটিই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ প্রায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার ফলে লক্ষ অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম-সাধনার দ্বারা একজন মুসলমানের যেসব পরিবর্তন হওয়া উচিত তার খুব কমই আমরা অর্জন করি। যাবতীয় মিথ্যা, অন্যায় ও পাপ থেকে যদি আমরা বছরের বারো মাস নিজেদের বিরত রাখতে ব্যর্থ হই তবে স্রেফ উপবাসের দ্বারা কিভাবে সমাজ কল্যাণের মহৎকাজ সম্পাদন সম্ভব ? মুসলমানদের সিয়াম-সাধনা শুধু উপবাস নয়, বরং যাবতীয় অন্যায়, অবিচার এবং কু-প্রবৃত্তিসমূহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এ জ্ঞান বা ধারণা আমাদের নেই বলেই শুধুমাত্র উপবাস পালনের মাধ্যমে নিষ্ফল অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে আমাদের রোযা ও আমাদের ঈদ-উৎসব।

যাকাত এবং উশর প্রদানকে আমরা সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই আমাদের অর্থ ও ধন-সম্পদ অপবিত্র রয়ে গেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে যুলুম, শোষণ ও অত্যাচার। নিরন্ন মানুষের হাহাকারে যখন আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে পড়ে তখনও আমরা সামাজিকভাবে কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাকে ধন-সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থার মৌলিক ধাপ হিসেবে চালু করতে ব্যর্থ হয়েছি। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী প্রতি বছর হজ্জ পালনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার পরেও সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফ ভিত্তিক মুসলিম উম্মাহর চেতনা আমাদের মাঝে বিকাশ লাভ করছে না। এর প্রকৃত কারণ এসব অনুষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমাদের ব্যর্থতা এবং অনাগ্রহ।

www.amarboi.org

শুধুমাত্র জ্ঞানের অভাব নয় বরং এক ধরনের নিরাসক্ত মন-মানসিকতাও এর জন্য দায়ী। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া সম্ভব। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আদর্শ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইসলাম ধর্মের মৌলিক চেতনাসমূহ বিসর্জন দিয়ে আমরা শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিচ্ছি। ফলে কোনো আদর্শ স্থাপনে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান কিংবা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজ উভয়ই ব্যর্থ হচ্ছেন মানুষ হিসেবে, বিশ্বাসী হিসেবে এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে সুন্দর সমাজ গঠনে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এবং বাস্তবে আমরা কি করে চলেছি সে সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে।

ঘুণে ধরা এ সমাজব্যবস্থাকে ভেংগে নূতনভাবে গড়ার দায়িত্ব আমাদের। কিভাবে তা করা সম্ভব সে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট। অতি স্বল্পকালের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যদি আমরা সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মহান আল্লাহ এবং নবী প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতে সচেষ্ট হই তবেই আমাদের এ জীবন সার্থক হবে। সার্থক হবে মানুষ হিসেবে জন্মলাভ। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পরেই আমরা আমাদের কাংখিত লক্ষে পৌঁছতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

❑

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন-১

ধর্ম কি ? এ প্রশ্নের জবাবে নবী মুহাম্মদ স. বলেছিলেন ধর্ম হচ্ছে "সৎস্বভাব"। তাঁকে বার বার একই প্রশ্ন করা হলে তিনি একই উত্তর দিয়েছিলেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, আল্লাহ্‌ মানুষকে যা দান করেছেন তার মধ্যে সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট কোন্‌টি ? তিনি বললেন "সৎস্বভাব"। তিনি আরো বললেন, "বরফ যেমন সূর্যের তাপে গলে যায়, সৎস্বভাব বা চরিত্র সেরকম মানুষের পাপকে নষ্ট করে ফেলে।" স্বভাবতঃই যাঁরা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁরা নিজেদেরকে সৎচরিত্রের অধিকারীরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

আমরা জানি কু-স্বভাব একটি পাপ। বস্তুত এটি এত বড় পাপ যে, এর বিপরীতে কোনো ইবাদাতে মানুষের কল্যাণ হয় না। কিন্তু এর বিপরীতে সৎস্বভাব এতবড় ইবাদাত যে, কোনো পাপ এর ক্ষতি করতে পারে না। অর্থাৎ সৎ-স্বভাবের অধিকারীএকজন বিশ্বাসীর সকল ইবাদাত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় কিন্তু কু-স্বভাব অজর্নকারীর কোনো ইবাদাত তার কাজে আসে না। একজন প্রকৃত জ্ঞানী বা বিশ্বাসী কু-স্বভাবের অধিকারী হতে পারেন না। কারণ প্রকৃত বিশ্বাসী বা জ্ঞানী জানেন যে মানব হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি-সমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই মানব জন্মের সার্থকতা। তাই সৎ স্বভাবের অধিকারী আমরা তাকেই বলি যিনি হৃদয়ের গভীরতার সাহায্যে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসায় মানুষকে আপন করে নিতে পারেন। মানুষ যদি অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় তখনই তার সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটতে থাকে। রিপুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুগম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ভালো ও মন্দের মানদণ্ড নিরসন করা প্রয়োজন। প্রকৃত ভাল ও প্রকৃত মন্দের পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা বা বিচারশক্তি অর্জনের পর মানুষ তার প্রবল ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে নিজেকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে পারে।

একথা সত্য যে, মনের হৃদয়ে অহংকার, কাম, ক্রোধ ও লোভ ও ঈর্ষার মত কু-প্রবৃত্তির সমূল উৎপাটন হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কঠোর সাধনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে মন নিয়ন্ত্রণকে সহজ-সাধ্য করে ফেলতে পারে। মন-নিয়ন্ত্রণের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে লোভ, ক্রোধ ও অন্যান্য কু-স্বভাবকে নিজের আজ্ঞাহীন করা সম্ভব। মন-নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে হবে যে, কু-স্বভাব

www.amarboi.org

ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাই যদি নিজের কু-প্রবৃত্তিকে দূর করতে চান তবে তাঁকে কু-প্রবৃত্তিসমূহের প্রতি প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। যিনি মানুষকে তীব্র বাক্যবাণে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পান তিনি কখনই মিষ্টভাষী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হন না। কু-স্বভাব থেকে মানুষ তখনই দূরে সরে থাকতে সক্ষম হবে যখন সে কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইবে। কু-প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করতে হলে প্রয়োজন সু-প্রবৃত্তির লালন ও বিকাশ সাধন। সৎ-স্বভাবের দ্বারাই মন্দ স্বভাবকে পরাস্ত করা যায়। কারণ উষ্ণতাকে পরাস্ত করতে পারে শীতলতা। যেমন—অহংকারকে দমন করতে পারে মানুষের বিনয়ী ও নম্র স্বভাব। আত্মসংশোধনের আগ্রহ ও চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তাহলে কু-প্রবৃত্তিসমূহ হতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই বিশ্বাসীগণ স্বীয় ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী আন্তরিকভাবে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহী হন। ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ মানব হৃদয়ে সৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো এবং সৎকর্মের প্রতি মানবগোষ্ঠীকে উন্মুখ ও উদ্বুদ্ধ করা।

আত্মোন্নয়নের পথে মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা অহংকার বা আত্মগর্ব। কারণ—

ক. আত্মগর্বী মানুষ নিজের জন্য যা পসন্দ করে অন্যের জন্য তা করে না,

খ. অপরের সাথে সে নম্র ব্যবহার করে না,

গ. পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় সে লিপ্ত হয়,

ঘ. ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে জর্জরিত হয়,

ঙ. নিজের বড়ত্ব জাহির করার জন্য সে কপটতা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে,

চ. আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকে।

একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য উপরের সকল গুণ অপরিহার্যভাবে ত্যাজ্য। ইসলাম ধর্মের মর্মকথা এই যে, সকল শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব শুধু আল্লাহর। অতএব, অহংকার শুধু তাঁর জন্যই শোভা পায় যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। পবিত্র কুরআনে অহংকারী লোকের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ○

"এভাবে প্রত্যেক অহংকারী ঔদ্ধত্ব ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহ সীলমোহর লাগিয়ে থাকেন।"–সূরা মুমিন ঃ ৩৫

www.amarboi.org

(খ)

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

"মূসা বললো, যারা হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করেন, অবশ্যই আমি প্রত্যেক এমন অহংকারী ব্যক্তি হতে আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি।"–সূরা মু'মিন ঃ ২৭

এ সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ স. বলেন ঃ

ক. "কারো হৃদয়ে শরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

খ. "অহংকারের কারণে ইবাদাতও ফলপ্রসূ হয় না।"

গ. "যে ব্যক্তি গভীরে পদচারণা করে এবং নিজেকে বড় বলে মনে করে, সে মহাপ্রভু আল্লাহকে তার উপর ক্রুদ্ধ দেখতে পাবে।"

অহংকার মানুষের জন্য এক জঘন্যতম অপরাধ ও চরমতম ক্ষতির কারণ। ইবলীশ শয়তানের অহংকার তাকে হযরত আদম আ.-কে সিজদা করতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহর আদেশ সে অমান্য করলো। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং মানব জাতির ক্ষতি করার জন্য সে প্রতিপক্ষের রূপ ধারণ করলো। সমগ্র সৃষ্টিজগতের অভিশাপ তার উপরে পড়লো। চির অভিশপ্ত শয়তান হিসেবে সে চিরদিন মানবজাতির ক্ষতির কারণ হয়ে রইলো।

শয়তানের এ পরিণতি থেকে মানুষের জন্য রয়েছে এক উত্তম শিক্ষা। কিন্তু বাস্তবে গর্ব ও অহংকারের মত কু-স্বভাব মানবজাতির চরম ক্ষতিসাধন করে চলেছে। মানুষ আজ প্রকৃতপক্ষে মানুষরূপি শয়তানে পরিণত হয়েছে। আমরা যদি অহংকারের কারণসমূহ চিহ্নিত করে এর ক্ষতিকর দিকসমূহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তবে এ কু-স্বভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

অহংকারী ব্যক্তির ধারণা যে, তার মধ্যে এমন বিশেষ গুণ রয়েছে যা অন্যের মধ্যে নেই। এ উপলব্ধি থেকেই অহংকারের জন্ম। সাধারণত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক উপলব্ধি রয়েছে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাবেই মানুষের অহমবোধ চাড়া দিয়ে ওঠে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে নৈতিক

www.amarboi.org

মূল্যবোধসমূহের শিক্ষার অভাবে আমরা জ্ঞানার্জনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছি। ফলে যে সামান্য বিদ্যা ও জ্ঞান আমরা লাভ করি তাতেই অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকি। আমরা ভুলে যাই যে, জ্ঞান অর্জনের এ ক্ষমতা ও যোগ্যতা যিনি আমাকে দিয়েছেন, সকল গরীমা ও শ্রেষ্ঠত্বের হকদার শুধু তিনি। নিজের অর্জিত জ্ঞানকে আমরা মানব-কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত করেও যদি এর কৃতিত্বের জন্য নিজের গরীমা প্রকাশে অভিলাষী হই সেক্ষেত্রেও অহংকার নামক ক্ষতিকর ব্যক্তি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না।

শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে নয় অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় পণ্ডিত বা আলেমদের মাঝেও এক ধরনের আত্মতৃপ্তিরভাব লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন যে, তাঁর নেতৃত্বে বা শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা তিনি মানুষের উপকার করছেন এবং ইহকাল ও পরকালে সম্মান ও মুক্তি তাঁর প্রাপ্য। এহেন মনোভাব অহংকারের নামান্তর মাত্র।

এজন্যেই মহানবী স. বলেছেন, "নিজে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা জ্ঞানের আপদ।" জ্ঞানের এ আপদ থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে যদি সে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। অপরের নিকট বাহাদুরী প্রকাশ করা নয় বরং অর্জিত জ্ঞান মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হলে সৃষ্টিকর্তার সন্তোষ লাভ করা সম্ভব এই বোধ যখন মানুষের মধ্যে সদা জাগরুক থাকে তখন তার মনে অহমিকার জন্মলাভ করতে পারে না। অতএব সারকথা এই যে, একজন বিশ্বাসী প্রকৃত পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট। কিন্তু যারা মূর্খ বিশ্বাসী তাঁরা তাদের মূর্খতার কারণে হৃদয়ে অহংকার ও গর্বের ভাব লুকিয়ে রাখেন কিংবা নিজেদের আচার-আচরণে তা প্রকাশ করেন।

জ্ঞানের আপদ হিসেবে অহংকারের জন্ম হয়, তেমনি বংশ মর্যাদা, ধন-সম্পদ, পেশী শক্তি, প্রভুত্ব-প্রিয়তা প্রভৃতি মানুষকে মনে মিথ্যা অহমিকার জন্ম দিয়ে থাকে। বস্তুত অহংকার রূপ পীড়া থেকে মুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অতএব আত্মোন্নয়নের প্রথম ও প্রধান সোপান হচ্ছে অহংকাররূপ পীড়া হতে মুক্তিলাভের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এ কাজটি তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ, যাঁরা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করেছেন। প্রথমত মানুষ যদি মহান সৃষ্টিকর্তার সকল গুণাবলী ও বিশালত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তখন সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র এক আল্লাহর। মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারো পক্ষেই অহংকার করা শোভা পায় না। এরপর মানুষ যদি তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা

www.amarboi.org

করে তখন সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, এ পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানোর পেছনে তার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা বা গুণ কাজ করেনি। যে প্রক্রিয়ায় ও পদ্ধতিতে একজন মানুষ এ পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সে লক্ষ করলে বুঝতে সক্ষম হয় যে, তার নিজের কোনো ভূমিকা সেখানে নেই।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর তার মেধা ও জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজের অপূর্ব শারিরীক ও মানসিক সৌন্দর্য বিকাশ সত্ত্বেও মানুষ অসহায় ও দুর্বল কেননা মানুষকে মেনে নিতে হয় তার অন্তিমকালকে। অবধারিত মৃত্যু এসে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। মাটির মানুষ মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শূন্য থেকে যেমন সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। অস্তিত্বহীন থেকে যেমন মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আবার তাকে জীবিত করা হবে। তার নিকট পেশ করা হবে তার জীবনের কার্যতালিকা বা আমলনামা। ভীষণ ভীতিপূর্ণ বিচারের দিন ধার্য করা হবে। কঠিন বিপদ ও অসীম যাতনার আশংকায় মানুষ তখন জড় পদার্থ কিংবা নিবোর্ধ পশু হয়ে জন্মলাভ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের তখন আর কিছুই করার থাকবে না। অতএব পরকালের অসীম যাতনার আশংকা যদি মানুষের মধ্যে ইহকালে সবসময় মনে থাকে তাহলে তার পক্ষে গর্ব বা অহংকার করার লিপ্সা থাকে না। মানুষ স্বভাবতঃই তখন বিনয়ী হবে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে তাই প্রতিদিন তার মস্তক অবনত করতে হয় মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট। বিনয়ী হবার শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়নের মধ্যেই বিশ্বাসীগণ নিজেকে অহংকার নামক রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে। অহংকার হতে মুক্তিলাভের জন্য মানুষকে অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে। মহানবী স. বলেন, "যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, মহান প্রভু আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।" মহানবী স. আরো বলেছেন, "বিনয় হচ্ছে ঈমানের মাধুর্য।" প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের জন্য বিনয় হচ্ছে তার মর্যাদার মাপকাঠি।

বিনয়ী হবার জন্য কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক এ প্রশিক্ষণ ছাড়াও মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে তার চলা-ফেরা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিনয়ের প্রকাশ ঘটাতে হবে। আত্মসংশোধনের জন্য মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে। শিক্ষক হিসেবে তার প্রথম কাজ হবে নিজের আচার-আচরণ ও মনোভাব বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে নিম্নের প্রশ্নসমূহ আত্মবিশ্লেষণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেঃ

www.amarboi.org

ক. আপনি কি মনে করেন যে, সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করলে মানুষ আপনাকে অবজ্ঞা করবে ?

খ. আপনি কি মনে করেন যে, ঘরে বা বাইরে নিজের কাজ নিজে করলে মানুষ আপনাকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করবে ?

গ. আপনার নিকট যখন কেউ কোনো কাজ বা আর্জি নিয়ে আসে তখন সে দাঁড়িয়ে কথা বললে আপনি কি মনে মনে সুখী হন ?

ঘ. আপনি কি মনে করেন যে, অধঃস্তন কারো সাথে দেখা করতে গেলে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে ?

ঙ. কারো নিকট সাক্ষাত করতে গেলে যদি সে দাঁড়িয়ে আপনার প্রতি সম্মান না দেখায়, সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে কষ্ট পান ?

চ. আপনি কি প্রায় সময় পরিষদ বা অধঃস্তনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে পসন্দ করেন ?

ছ. আপনার অতি পসন্দনীয় বা কাংখিত কোনো বস্তু বা পদ যদি অন্য কেউ পায় সে ক্ষেত্রে আপনি কি দুঃখিত হন ?

জ. আপনি কি অধঃস্তনদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করাকে প্রয়োজনীয় গুণ বলে মনে করেন ?

ঝ. আপনাকে কেউ অবজ্ঞা বা অসম্মান করলে আপনি কি মর্মপীড়া অনুভব করেন ?

ঞ. আপনি কি ক্রোধ, ঈর্ষা ও পরনিন্দা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম ?

ট. নিজের কাজকে অন্যের নিকট তুলে ধরার জন্য মিথ্যা, কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করাকে আপনি কি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন ?

ঠ. আপনি কি প্রায় সময় আত্মপূজা বা স্বীয় কথাকে সমুন্নত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন ?

উপরের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব ধীর স্থিরভাবে বের করতে চেষ্টা করা দরকার। উপরের এসব বা এ ধরনের প্রশ্নাবলীর অধিকাংশের জবাব যদি নেতিবাচক হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনি অহংকার নামক রোগ থেকে অধিকাংশ মুক্ত। আর যদি ইতিবাচক হয় তাহলে আপনি কি পরিমাণ রোগাক্রান্ত তা পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে। রোগের পরিমাণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কঠোর সাধনা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষের পক্ষে এ রোগ হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

অহমিকা বা অহংকারের মূল কারণ মানুষের অজ্ঞতা। আমাদের মধ্যে যে এ রোগ রয়েছে তা আমরা অনেকেই জানি না বা বুঝি না। অতএব এ

www.amarboi.org

রোগের প্রতিকার করতে চাইলে নিজের রোগ সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানতে হবে। নিজের পক্ষে নিজেকে জানা সম্ভব না হলে মনোবিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক সাধকদের সাহায্যে নিজের রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে অহমিকা ও গর্ব করে থাকে। তাদের এ আচরণের পেছনে তারা মনে মনে যুক্তিও স্থাপন করে থাকে। তারা মনে করে যে, পৃথিবীতে তার যোগ্যতা ও সামর্থের কারণেই সে উত্তম এবং অন্যরা তার তুলনায় অধম। যেমন একজন বিশ্বাসী এই ভেবে গর্বিত হতে পারেন জীবনে তিনি যথাসাধ্য সৎকর্ম করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিজের কাজকে উত্তম ভেবে প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে আত্মগরীমা প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। কেননা যে ইচ্ছাশক্তির বলে একজন বিশ্বাসী নিজেকে সৎকর্মে লিপ্ত রেখেছেন সে ইচ্ছাশক্তি এবং সৎকর্ম করার সামর্থ মহান আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহর করুণাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণেই তার পক্ষে সৎকাজ করা সম্ভব হয়েছে এবং আল্লাহর ক্রোধের কারণেই অন্যরা সৎকর্মের প্রতি উদাসীন থেকেছে এ বোধ যদি না থাকে তাহলে তিনি প্রকৃত পরহেজগার হতে পারেন না।

ক্ষমতার অধিকারী ও সমাজের উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিগণ তাদের দায়িত্ব পালনে কল্যাণমূলক ও জনসেবামূলক সেবা কাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আত্মগরিমায় লিপ্ত হতে পারেন। এদের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা সহজেই বুঝতে পারেন যে, মানুষের যে কোনো কাজ সংঘটিত হয় তার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা। এ তিনটি ক্রিয়াশীল ইতিবাচক ভূমিকা ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে কোন সৎকর্ম করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু সৎকর্মের জন্য গর্বিত হওয়ার কোনো অবকাশ জ্ঞানী মানুষের নেই। কেননা যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থের বলে মানুষ সৎকর্ম করে থাকে তা মানুষের নিজের সৃষ্টি নয়। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জ্ঞান, গুণাবলী, উপযুক্ততা, শক্তি ও ইচ্ছা সবকিছু আল্লাহর দান। অতএব সৎকর্ম করার তাওফিক দান করার জন্য প্রকৃত বিশ্বাসীরা মহান আল্লাহর নিকট আকৃষ্ট চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

নিজেকে সৎকর্মী বলে মনে করা আত্মগর্বের লক্ষণ। আত্মগর্ব থেকে অহংকারের জন্ম এবং আত্মগর্বী লোক মনে করে চেষ্টা ও পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন নেই। আত্মগর্বী লোক নিজে যা করে তাকেই সর্বাঙ্গ সুন্দর বলে মনে করে। সে নিজের অন্যায় ও পাপ দেখতে পায় না। সে নিজেকে আপদমুক্ত মনে করে। সে আত্মপ্রশংসায় নিজেকে বিভোর করে রাখে। সে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলে ভাবে এবং এজন্য অন্যের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে আগ্রহী নয়। সে কারো উপদেশও গ্রহণ করে না। ফলে আত্মগর্বী একজন

www.amarboi.org

মানুষ পূর্ণতা লাভে বঞ্চিত হয়। অতএব আত্মগর্ব ও অহংকার তার ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়ে।

কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পদে পদে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হয়ে থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, গর্ব প্রভৃতি মানুষকে সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে। মানবীয় কু-প্রবৃত্তিসমূহ মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে। পরকালের ভয় থেকে মানুষ উদাসীন হলেই কু-প্রবৃত্তি তার মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে। কু-প্রবৃত্তি মানুষের পরকালীন মুক্তিলাভের পথে প্রতিবন্ধক। মানুষের মধ্যে যদি এ বোধ জাগরুক থাকে এবং সে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে তবে তার জন্য কু-প্রবৃত্তিসমূহ দূর করা সম্ভব।

বাস্তব জীবনে অধিকাংশ মানুষ পরকালের সংকট সম্পর্কে উদাসীন। কারণ সে সংসারের মোহে মুগ্ধ। সংসারের মোহ মুক্তির জন্য সংসার বিরাগী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির। অবিশ্বাসীরা পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করে না। অতএব তাদের পক্ষে পরকালের সংকট সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সন্দেহ-বাদীদের সংখ্যা সম্ভবত অবিশ্বাসীদের চেয়ে বেশী।

সংশয়বাদীরা পরকাল সম্পর্কে একেবারে অবিশ্বাসী নয় কিন্তু তাদের মনে নানা প্রশ্ন নানা সন্দেহ। এরা মনে করে দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক যেহেতু পরকালের বিচার সম্পর্কে এরা সন্দীহান। তার ফলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আনন্দ, ফূর্তি ও উপভোগের জন্য নিয়োজিত করাকে শ্রেয় মনে করে। এদের নিকট হযরত আলীর জবাব স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি এক অবিশ্বাসীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "তুমি যা মনে করছো (পরকাল বলে কিছু নেই) তাই যদি সত্য হয় তাহলে কোনো মানুষকেই পরকালে (পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে) কষ্ট ভোগ করতে হবে না। আর তোমার ধারণা মিথ্যা হলে আমরা (পরকালে বিশ্বাসীগণ) মুক্তি পাব এবং তোমরা (পরকালে অবিশ্বাসীগণ) শাস্তিতে নিপতিত হবে।" পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ
جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ج
كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১৪—

www.amarboi.org

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হলো জান্নাতবাসী। এতেই তারা থাকবে অনন্তকাল। আর যারা অসৎকর্মের বদলায় করেছে অকল্যাণ, সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হলো জাহান্নামবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।"–সূরা ইউনুস ঃ ২৬-২৭

পরকালের বিচার ও পুরস্কার হয় সত্য কিংবা মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা দুটোই হতে পারে না। দুটি বিপরীতধর্মী কথা সত্য হতে পারে না। অতএব বাকী অপেক্ষা নগদগ্রহণের যুক্তি বিভ্রান্তিকর। বাকী যদি নগদের তুলনায় সহস্রগুণ উত্তম বলে প্রতিভাত হয় তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারের মোহের কারণে অসৎকর্মের দিকে ধাবিত হতে পারে না। সৎকর্ম যখন পরকালীন চিরমুক্তির পথ হিসেবে মানুষের নিকট চিহ্নিত করা হয়েছে তখন মানুষ পৃথিবীর এ খণ্ডকালীন জীবনে যত কষ্টকরই হোক না কেন অসৎকর্ম থেকে নিজেকে পরিহার করে চলতে চাইবে। অসৎকর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সুখের পরিবর্তে সৎকর্মের দ্বারা অনন্ত সুখের জন্য লালায়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অবুঝ শিশু সন্তানের ইহকালীন ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য যদি আমরা তাকে শাসনের শিকলে বাঁধতে চাই তবে মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান (সৎকর্মের সম্পাদন ও অসৎকর্ম প্রতিরোধ) মানুষের কল্যাণের জন্য একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। অতএব বর্তমান জীবনকে নগদ ও বাস্তব এবং পরকালকে বাকী ও সন্দেহপূর্ণ মনে করে দুনিয়ার মানুষের অসৎ হবার যুক্তি আত্মপ্রতারণার শামিল।

অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজের দুর্বলতার অজুহাত হিসেবে এ ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করে যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু, সুতরাং তিনি সকলকেই ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى -

"মানুষ যতটুকু চেষ্টা করেছে, ততটুকু ভিন্ন তার জন্য আর কিছুই নেই।"
–সূরা নাজম ঃ ৩৯

নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, অথচ আল্লাহর নিকট থেকে সুফল পাবার আশা করে সে নিতান্ত নির্বোধ।" বস্তুত যে ব্যক্তি জেনে শুনে পাপ করে সেই বেশী শাস্তির যোগ্য। অতএব শুধুমাত্র

www.amarboi.org

অন্যায়কে অন্যায় ও ন্যায়কে ন্যায় বলে জানলেই হবে না বরং সত্যের স্বপক্ষে ও মিথ্যার বিপক্ষে নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে পরিচালিত করতে হবে। সত্য ও মিথ্যাকে তথা ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও নিজের মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষ নিজেকে পরিচালিত করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। মানুষ নিজে যা মনে করে তাই ভালো। নিজের সকল কাজকেই সে উত্তম মনে করে থাকে। এ এক চরম বিভ্রান্তি। ভুল বিশ্বাসের কারণে মানুষের মুক্তি আসবে না। তাকে অবশ্যই ভালো-মন্দের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত পথ ও পদ্ধতিকে। মানুষকে এমন সব জ্ঞান অর্জন করতে হবে যা সৎস্বভাব ও চরিত্র উন্নতিকর। যে শিক্ষা মানুষকে মানবীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত করতে ব্যর্থ হয় সে শিক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। পদে পদে প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা ও শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্ত রাখতে যে জ্ঞান মানুষকে সাহায্য করে সে জ্ঞান অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মধ্যেই মানবমুক্তি নিহিত রয়েছে। পরিমিত অর্থ-সম্পদে সন্তুষ্ট থেকে হৃদয়ে মৃত্যু চিন্তাকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে পারলে মানুষ প্রকৃত মানবীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত হবার আশা করতে পারে। আল্লাহ ভীতি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই মানুষের পক্ষে এ গুণ অর্জন করা সম্ভব।

❐

www.amarboi.org

বিশ্বাস ও আত্মোন্নয়ন-২

দোষে-গুণে মানুষ। মানুষ ফেরেশতা বা শয়তান কোনোটিই নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্পাপ থাকা যেমন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না তেমনি চিরকাল পাপে ডুবে থাকে এমন মানুষও সম্ভবত নেই। জীবনের চলার পথে পদে পদে মানুষের স্খলন-পতন হয়। কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতত যুদ্ধ করেই মানুষকে সুপ্রবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে হয়। রিপুর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে মানব হৃদয়কে কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম করতে হয়।

মানুষের পক্ষে কুপথ থেকে সুপথে ফিরে আসা সম্ভব। কুপথ থেকে সুপথে ফিরে আসাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় "তাওবা"। একজন বিশ্বাসী যখন তার কোনো অন্যায় ও পাপ কাজের জন্য অনুতাপের পর আল্লাহর পথে (সুপথে) ফিরে আসেন তখনই তিনি কৃতকার্য হন। বিশ্বাসীদেরকে লক্ষ করে তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো যেন তোমরা কৃতকার্য হতে পার।"–সূরা নূর ঃ ৩১

নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন, "কোনো মানুষই নিষ্পাপ নয়, কিন্তু যে মানুষ তাওবা করে সে সকল পাপীদের মধ্যে উত্তম।" তিনি আরো বলেছেন, "পাপ করে, সেই পাপের ত্রি-সীমায় পুনরায় না যাওয়াকেই তাওবা বলে।"

মানুষ কোনো অন্যায় ও পাপ করার পর যদি অনুতাপের অনলে নিজের হৃদয়কে পোড়াতে সক্ষম হয় তখন তার মনোরাজ্যে এমন পরিবর্তনের সূচনা হয় যে, পুনরায় তার পক্ষে সেই পাপ করা সম্ভব হয় না। সচেতনভাবে সঠিক পরিমাণ অনুতাপ না হলে তাওবা পূর্ণ হয় না। মানুষ আবার সেই একই পাপের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। কিন্তু সঠিক পরিমাণ সচেতন অনুতাপ নির্ভর করে বিশ্বাসের গভীরতার উপর। বিশ্বাসের ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তবে অনুতাপের অগ্নি মানবের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। এজন্য মানুষকে প্রথমে তাওবা করতে হয় সকল প্রকার আল্লাহদ্রোহিতা থেকে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবনের সকল কাজ করার জন্য মানুষের প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার না থাকলে ঈমানের আলোকে মানুষ পথ চলতে সক্ষম হয়

www.amarboi.org

না। ঈমানের আলোকে পথ চলতে না পারলেই পদে পদে সে অন্যায় ও পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

পাপ মানুষের হৃদয়ে অন্ধকারের পর্দা সৃষ্টি করতে থাকে। মানুষ যতোই পাপ করতে থাকে হৃদয়ে অন্ধকারের আবরণ ততোবেশী গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে। আন্তরিক অনুতাপের সাহায্যে সুপথে প্রত্যাবর্তন করা হলে অন্ধকারের পর্দা দূরীভূত হয়। পাপ যতো বেশী হবে অনুতাপের অনল ততো বেশী না হলে ঘনীভূত অন্ধকার দূর করা সম্ভব হয় না। পাপের পরিমাণ যদি আকাশ ছোঁয়া স্তুপের পরিমাণও হয় তবু তাওবার দ্বারা অন্ধকারের পর্দা দূরীভূত করা সম্ভব। পাপ যতো ছোট হয় তাওবাও ততো সহজ হয়। কিন্তু ছোট পাপের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ও হটকারিতা করলে তাওবা কঠিন হয়ে পড়ে। ছোট পাপ (সগীরা গুনাহ) হটকারিতা করে বার বার করলে তা বড় পাপে (কবীরা গুনাহ) পরিণত হয়। পাপ ছোট কিংবা বড় যাই হোক না কেন পাপ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে—

ক. আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন,

খ. সংঘটিত পাপের ক্ষতিপূরণ করা প্রয়োজন,

গ. একই পাপ পুনরায় না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রয়োজন,

ঘ. পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে এ ভয় এবং তাওবার দ্বারা ক্ষমা পাবার আশা পোষণ করা প্রয়োজন।

ঙ. ইসতিগফার পাঠ করা, তাওবার নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখা প্রয়োজন।

এ ছাড়াও কোনো অন্যায় ও পাপ করার পর—

ক. পাপ যত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হোক না কেন তা উপেক্ষা করা উচিত নয়,

খ. পাপ কাজ করার পর আনন্দ ও গর্ব করা উচিত নয় এবং

গ. নিজের পাপ প্রকাশ করা উচিত নয়।

পাপের ক্ষতিপূরণ করা যায় পুণ্যের সাহায্যে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط

"নিশ্চয়ই পুণ্য পাপকে মিটিয়ে দেয়।"–সূরা হূদ ঃ ১১৪

পাপ হৃদয়ে মলিনতার সৃষ্টি করে এবং পুণ্য বা সৎকাজ হৃদয়কে আলোকিত করে। অন্যায়ের পরিমাণ যতো বেশী হবে তাওবা ও সৎকাজের পরিমাণ ততো বেশী হওয়া প্রয়োজন। নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "মন্দ কাজ ঘটে গেলে

www.amarboi.org

অবিলম্বে সৎকাজ করো, তাহলে সৎকাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে।" বাস্তব জীবনে আমরা পাপ করার সাথে সাথে তাওবা করি না বা পাপের ক্ষতিপূরণ করতে সচেষ্ট হই না। কারণ আমরা মনে করি ঃ

ক. আল্লাহ্ নিশ্চয় মাফ করবেন অতএব পাপ করলে ক্ষতি নেই কিংবা,

খ. এখন পাপ করে পরে তাওবা করলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

পরকালের প্রতি সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং নগদ প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করতে না পেরে আমরা অনবরত পাপ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, মানব জীবন অনিশ্চিত। অনিশ্চয়তাই জীবনের একমাত্র নিশ্চিত বিষয়। মানব জীবনের সকল অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর নিশ্চয়তা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও আমরা জানি না কখন, কার, কিভাবে কোথায় মৃত্যু হবে। মৃত্যুর কঠিন, শীতল, অবধারিত বাস্তবতা মানুষকে মেনে নিতে হয়। যে জীবনকে নগদ মনে করে মানুষ আনন্দ-ফূর্তিতে বিভোর থাকে সে জীবন মুহূর্তেই নিথর, নিরব ও নিষ্ফল হয়ে যায়। কোনো প্রচেষ্টার ফলেই তার পক্ষে আর সেই আপাতঃ মধুময় জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। পরকালের যে জীবনকে অনেক দূর (বাকী) বা অনিশ্চিত মনে হয়েছে, মৃত্যুর পরেই সে জীবন বর্তমান ও নগদ প্রতিভাত হবে। অতএব, নগদ ও বাকীর মধ্যে তফাত শুধু একটি মাত্র মুহূর্ত। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না সেই অবধারিত মুহূর্ত কিভাবে কখন কার সম্মুখে এসে পড়বে। অতএব তাওবা করতে তথা পাপ থেকে ফিরে আসতে বিলম্ব করলে, তাওবার ফুরসৎ আদৌ পাওয়া যাবে কি না আমরা জানি না।

তাওবা করে তা সুফল হওয়ার আশা করা কর্তব্য। কিন্তু পাপের জন্য দুঃখিত না হয়ে তাওবা করার আশায় থাকা বোকামি ও মূর্খতার পরিচায়ক। তাওবা ব্যতিরেকে ক্ষমা পাবার আশা করাও নির্বুদ্ধিতা মাত্র। যদি হৃদয়ে অনুশোচনা হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি আশা করা হয় যে, আল্লাহ তাওবা করার সুযোগ দিবেন, তবে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু পাপের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে সুপথে ফিরে আশা সম্ভব হয় না।

হৃদয়ে আশা ও ভয় মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط - الزمر : ٥٣

"তোমরা কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"

—সূরা যুমার ঃ ৫৩

www.amarboi.org

নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন, "মানুষ যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় বিরক্ত না হয়, আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ ক্ষমা করতে বিরক্ত হন না।" ক্ষমাপ্রাপ্তির আশার পাশাপাশি মানুষকে শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে ভীত হতে হবে। মানব হৃদয়ে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসংগে হযরত উমর রা.-এর একটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "পরকালে কিয়ামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে, কেবল একজন মাত্র জান্নাতে যাবেন, তবে আমি মনে করবো যে, আমিই সে ব্যক্তি। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে, জাহান্নামে মাত্র একটি লোক যাবে, তবে আমিই সে ব্যক্তি কিনা ভেবে আমার ভয় হবে।"

আল্লাহর শাস্তির ভয় মানব চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। চারিত্রিক পবিত্রতা, বলিষ্ঠতা তথা তাকওয়া ও পরহেজগারী ভয়ের ফল এবং সৌভাগ্যের চাবি-কাঠি। ভয় মানুষকে কু-প্রবৃত্তি থেকে সরিয়ে রাখে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

"হেদায়াত ও রহমত ঐ সকল লোকের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।"

নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সমস্ত দুনিয়া তাকে ভয় করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সবকিছুই তাকে ভয়প্রদর্শন করে।" তিনি আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে, সে অধিক বুদ্ধিমান।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহকে অধিক ভয় করে সে কিয়ামতের দিন অধিক নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক জানতে পারবে তার ভয় অধিক হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে যতো অল্প জানে সে ততো বেপরোয়া ও নির্ভয় হয়ে থাকে। এ কারণেই নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "আমি অধিক জানি বলেই অধিক ভয় করি।" বস্তুত বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

আল্লাহকে চেনার সাথে সাথে মানুষ যদি নিজের সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ করে এবং আল্লাহর সমস্ত দয়া ও দানের কথা স্মরণ করে তখন তার অপকর্মের জন্য তার মনে ভয় ও অনুতাপ সৃষ্টি হয় এবং সে তাওবার মাধ্যমে সুপথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। যে ভয় মানুষকে পাপ থেকে ফেরাতে পারে না তা প্রকৃত ভয় নয়। যখন মানুষ আল্লাহর ভয়ে নিজেকে পাপ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে তখনই সে সফলকাম হতে পারে। মানুষকে তাই আত্মোন্নয়নের সোপান হিসেবে প্রথমে নিজেকে জানতে হবে। এরপর আল্লাহর প্রতি

www.amarboi.org

বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে এবং আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে জানতে ও চিনতে হবে। মানুষ নিজেকে এবং আল্লাহকে চিনলে তার পক্ষে আর নিশংক ও নির্ভয় থাকা সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো পাপের সময় তার হৃদয়ে ভয় প্রবল হয়ে জেগে উঠবে এবং নিজেকে সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে।

পাপের সময় ভয় ও সৎকাজের সময় আশা করা পুণ্যবান মানুষের লক্ষণ। নিজের কর্তব্য সম্পাদনের পর সুফল লাভ করার কল্পনাকে আশা বলে। পাপের শাস্তি যেমন তৎক্ষণাৎ হয় না সৎকাজের বিনিময়ও তাৎক্ষণিক লাভ করা যায় না। মানুষকে তাই ধৈর্যের সাথে সুপথে চলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। ধৈর্য বা 'সবর'কে বলা হয়েছে "ঈমানের অর্ধেক।" পবিত্র কুরআনে 'সবর'-এর প্রয়োজনীয় সুফল সম্পর্কে বার বার তাকিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـٰبِرِينَ "আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে (সহায়করূপে) আছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩। নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, "সবরের সাথে সচ্ছলতা ও শান্তির প্রতীক্ষায় থাকা ইবাদাত।" কিন্তু প্রায়ই আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। অধিক ধন-সম্পদের আশায় আশ্বান্বিত হয়ে দারিদ্রতাকে আমরা অভিশাপ মনে করি। কিন্তু আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ ধনী অপেক্ষা ধৈর্যশীল দরিদ্র উৎকৃষ্ট। লোভী ধনী অপেক্ষা লোভী দরিদ্র উৎকৃষ্ট। তুষ্ট ধনী অপেক্ষা তুষ্ট দরিদ্র উৎকৃষ্ট। কিন্তু লোভী দরিদ্র অপেক্ষা নিরাসক্ত ধনী উৎকৃষ্ট।

বস্তুত ধন-সম্পদ ও দারিদ্রতা উভয়ই মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করতে পারে। কারো পক্ষে দারিদ্রতা সুপথের অন্তরায় আবার কারো নিকট ধন-সম্পদ সুপথের অন্তরায় হতে পারে। মানুষের জন্য পরিমিত ধন-সম্পদের প্রয়োজন। এজন্যই নবী মুহাম্মদ স. প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ-এর পরিবার-পরিজনকে অভাব মোচনের উপযোগী জীবিকা দান করো।" মানুষের মৌলিক চাহিদা—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান। যে কোনো মৌলিক প্রয়োজনে সর্বনিম্ন চাহিদার অতিরিক্ত লোভ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। জীবনের এ ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা উদাসীন। ফলে আমরা ক্রমশ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য নীতি, নৈতিকতার বিসর্জন দিয়ে চলেছি। চাহিদা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমরা নিজেদেরকে শামিল করতে গিয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আজকের সমাজ ব্যবস্থায়, যাবতীয় দুর্নীতির মূল উৎস এখানেই।

দারিদ্রতা অবশ্যই মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায় যদি মানুষ দারিদ্রতার কারণে সুপথ থেকে কুপথে অগ্রসর হয়। আবার দারিদ্রতা মানুষের সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে যখন মানুষ দারিদ্রতা সত্ত্বেও সুপথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

www.amarboi.org

বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর কৃতজ্ঞ থাকা প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য অপরিহার্য গুণ। কিন্তু উপার্জন বিরত থাকা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকার (তাওয়াক্কুল) জন্য কোনো শর্ত নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"

–সূরা তালাক ঃ ৩

(খ)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

"যারা তাওয়াক্কুল করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য জীবিকা প্রয়োজন। আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার অর্থ এই নয় যে, নির্জন বনে বা গুহায় গিয়ে জীবিকার জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। অল্প আশা এবং পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত মনোভাব থাকলে মানুষ অতি অল্পেই তুষ্ট এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীবন ধারণের অপরিহার্য উপকরণ পরিহার করা তাওয়াক্কুল নয় বরং মনে-প্রাণে আল্লাহর করুণা ও দয়ার উপর ভরসা রাখা এবং উপকরণের উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে। ঘরে তালা লাগিয়ে দেয়ার পর তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করাকে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা বলে। রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবনের পর ঔষধের উপর ভরসা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা মানুষের উচিত।

আল্লাহ যা করেন তা কল্যাণের জন্য করেন। এ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করতে না পারলে তাওয়াক্কুল করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রচুর মানসিক শক্তির প্রয়োজন। চিন্তামুক্ত মন না থাকলে মানসিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না। মনের শক্তি ও শান্তি অর্জনের জন্য অহেতুক দুর্ভাবনাকে মন থেকে দূরীভূত করা প্রয়োজন। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করার গুণ অর্জনের দ্বারা মনের দুর্ভাবনা দূর করা সম্ভব। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা না করতে পারলে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে পারা যায় না। কেননা জীবনের প্রতিটি

www.amarboi.org

পদক্ষেপে, সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাকেই তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) বলে।

দারিদ্র্যতার অজুহাতে আমরা অনেক সময় পাপ কাজ করার পেছনে খোড়া যুক্তি উত্থাপন করে থাকি। চোর সম্ভবত চুরি করার পূর্বে মনে মনে ভাবে যে তার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে সে চুরি করছে অতএব চুরি করা অন্যায় নয়। ঘুষ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও সম্ভবত তাদের দুর্নীতির অজুহাত হিসেবে আর্থিক অনটন ও প্রয়োজনের তাকিদে ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় মনে করে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা জানেন যে, সৎ উদ্দেশ্যে পাপ কাজ করলে তা কখনো পুণ্য কাজে পরিণত হয় না।

সৎকাজ হচ্ছে তাই যা শরীয়ত নির্দেশিত। সৎকাজ করলে যে পুণ্য পাওয়া যায় তার নিয়ত বা সংকল্প করলেও অনুরূপ পুণ্য অর্জিত হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য সৎ হলেও কোনো অসৎকাজ সৎকাজে পরিণত হতে পারে না। নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে কাজ একজন বিশ্বাসী করেন, তাই বিশুদ্ধ সৎকাজ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভের জন্য যদি কোনো কাজ করা হয় এবং মনে মনে এই আশা পোষণ করা হয় যে, লোকে সৎ ও পুণ্যবান বলে প্রশংসা করবে তবে তা সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে না। লোকের প্রশংসা ও ভক্তি অর্জনের ইচ্ছা থেকে নিয়তকে নিষ্কলংক রাখা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। হৃদয়ের পরিপূর্ণ আন্তরিকতা যখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের জন্য নিবেদিত হয়, তখনই শুধু মানুষ ইখলাসের সাথে সৎকাজ করেছে বলে মনে করা হবে। পার্থিব ধন-সম্পদ, সম্মানের প্রতি আমাদের কামনা-বাসনা যতো বেশী হয়, আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করা আমাদের জন্য ততো দুরূহ হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যের সাথে প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ জড়িত থাকলে সৎকাজ নির্দোষ থাকে না। পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যের সাথে ভ্রমণ বা ব্যবসার উদ্দেশ্য যদি মনে মনে থাকে তবে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে হজ্জের জন্য যে পুণ্য পাওয়া সম্ভব তা অর্জিত হয় না।

সংসারের সকল আসক্তি হতে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত দুরুহ। মানুষের অহংবোধ যখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখনই মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি পাওয়ার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। মানুষ এ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হলে আল্লাহ যেভাবেই মানুষকে রাখেন, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জন তার একমাত্র কামনায় পরিগণিত হয়। মনের এ অবস্থা অর্জিত হলেই মানুষের পূর্ণতা তথা ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। বিশ্বাসী ব্যক্তি তখন "সিদ্দীক" বা সত্যপরায়ণ বিশ্বাসীতে পরিণত হন। সত্যপরায়ণ বিশ্বাসীর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ছাড়া আর কোনো কিছুর

www.amarboi.org

আকাংখা থাকে না। আল্লাহর সন্তোষ লাভের কামনার সাথে অন্য আশা মনে থাকলে সেই ব্যক্তির ঈমানের পূর্ণতা না আসার লক্ষণ।

ঈমানের পূর্ণতা প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণ বিশ্বাসের এই স্তরে অর্থাৎ "সিদ্দিক" এর মর্যাদায় পৌঁছার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়। আত্মোন্নয়নের পথ-পরিক্রমায় মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয় পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষে। প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমেই মানুষ সফলতার স্বর্ণশিখরে উঠতে সক্ষম হয়। আমাদের সবার পক্ষে হয়তো সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণের সৌভাগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার পর ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পর আমাদের সবার লক্ষ হওয়া উচিত সেই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া।

এজন্য যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা প্রতিদিনের কৃতকর্মের পর্যালোচনা করে আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা নিয়ে থাকেন। তারা জানেন যে, মানব-জীবনের স্বল্পকালীন সময়ে যতোবেশী সৎকর্ম মানুষ করতে সক্ষম হবে ততোই তার পরকালীন জীবন কল্যাণময় হয়ে উঠবে। নবী মুহাম্মদ স. এ প্রসংগে বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কাজ করে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" তিনি আরো বলেছেন, "যে কাজ সম্মুখে আসে তা পরীক্ষা করে দেখ, হিতকর হলে করো, অনিষ্টকর হলে দূরে সরে থাক।" হাদীস শরীফে অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষের প্রতিটি কাজের জন্য তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। যেমন ঃ

ক. কেন করলে ?

খ. কিভাবে করলে ?

গ. কার জন্য বা কি উদ্দেশ্যে করলে ?

মানুষ যদি প্রতিদিন এভাবে তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিতে থাকে, তখন সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, প্রকৃত অর্থে তার কাজ আল্লাহর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে এবং যথোচিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে কি না।

সত্যিকার অর্থে আমরা পুণ্য কাজ গণনার ব্যাপারে যতো উৎসাহী, নিজের পাপ গণনার ক্ষেত্রে ঠিক ততোটা অনুৎসাহী। তসবীহ হাতে আমরা আল্লাহর যিকির-এর হিসাব করি ঠিকই, কিন্তু প্রতিদিন কতবার মিথ্যাচার, ছল-চাতুরীর আশ্রয়গ্রহণ করেছি তার কোনো হিসাব আমরা রাখি না। আত্মোন্নয়নের জন্য পুণ্যের নয়, পাপের হিসাব রাখা জরুরী। শুধু হিসাব রেখেই ক্ষান্ত হলে কোনো ফায়দা হবে না। পাপ কাজের পেছনে যে প্রবৃত্তিসমূহ কাজ করে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রবৃত্তি নিগ্রহের দ্বারা মানুষ

www.amarboi.org

পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। প্রতিদিন প্রতিটি পাপ চিন্তা ও পাপ কাজের হিসাব যদি আমরা করি এবং মনে মনে স্বীয় প্রবৃত্তিকে শাসন ও তিরস্কার করতে থাকি তবে ক্রমশঃ আমরা আত্মসংশোধনের মাধ্যমে নিজে কে গড়ে তুলতে সক্ষম হব। নিজের সাথে নিজের এই বুঝাপড়া করার প্রক্রিয়া কোনো সময় বন্ধ করা উচিত নয়। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিবিষ্ট মনে সমস্ত দিনের কার্যকলাপ একের পর এক স্মরণ করে, পাপ চিন্তা ও পাপ কাজের জন্য নিজের নিকট নিজে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রতিটি অসৎ চিন্তা ও কাজের পেছনে লোভ, লালসা, কামনা অত্যন্ত সক্রিয় ও প্রবল ভূমিকা পালন করে থাকে। সে সময় আমরা ভুলে যাই যে, আল্লাহ্ আমাদের পাপ দেখছেন, অথবা মনে করি সব পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন অথবা এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে থাকি যে, পরে তাওবা করে সুপথে ফেরা সম্ভব হবে। বাস্তবে আমাদের এসব ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিশ্বাসীদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ সবসময় আমাদের দেখছেন, সব অন্যায়ের তিনি শাস্তি দিবেন, ন্যায় কাজের পুরস্কার দেবেন এবং যে সময় অতীত হয়ে যায় তা আর ফিরে আসবে না।

অতএব প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা বিশ্বাসীদের জন্য অতীব জরুরী। নবী মুহাম্মদ স. তাই বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিকাশ করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কাজ করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" প্রতিটি বিশ্বাসীর উচিত প্রতিদিন সকালে সৎকাজের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং নিদ্রার পূর্বে সকল কাজের হিসাব নিকাশ করা। মানুষ যদি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তখন সে নিজেকে ক্রমশঃ সকল পাপ কাজ থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

নিজের প্রবৃত্তির সাথে এভাবে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে মানুষকে সফলতার স্বর্ণশিখরে ওঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। সৎগুণাবলী অর্জনের জন্য সৎচিন্তা সবসময় মনে জাগরুক রাখতে হয়। মানব মনে সৎচিন্তা সবসময় জাগিয়ে রাখতে হলে সৎগুণাবলীর একটি তালিকা তৈরী করা প্রয়োজন। তালিকা অনুযায়ী প্রশ্নাবলীর জবাব চাইতে হবে নিজের কাছে নিজেকে। নমুনা প্রশ্নাবলী নিম্নরূপ ঃ

ক. আত্ম-শ্লাঘা, অহংকার, ঈর্ষা, কৃপণতা, ক্রোধ, বাচালতা, ধন ও মাল লিপ্সা ইত্যাদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও মন্দ-স্বভাব বলে আমি মনে করি কি ?

খ. উপরে বর্ণিত ক্ষতিকর ও মন্দ-স্বভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমি কি দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ?

www.amarboi.org

গ. যখনই আমি কোনো অন্যায় বা পাপ করে থাকি, তখনই কি অনুতাপের সাথে অন্যায়ের পথ থেকে আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়ে থাকি ?

ঘ. সকল বিপদ-আপদে এবং প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে আমি কি সত্যপথে অটল ও ধৈর্যশীল থাকতে সক্ষম ?

ঙ. সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পথ, পদ্ধতি বা উপকরণ বাধা হিসেবে গণ্য হতে পারে সেসব হতে বঞ্চিত হলে আমি কি আনন্দিত হই এবং এজন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি ?

চ. সৎ ও সত্য পথে যে ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান আমি পেয়েছি তা একমাত্র আল্লাহ্ দয়া করে দান করেছেন এরূপ অনুভূতি কি সবসময় আমার মনে জাগরুক থাকে ?

ছ. আল্লাহ্ আমাকে যখন, যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থাকে আমি স্বাভাবিক চিত্তে গ্রহণ করতে সক্ষম কি ?

জ. আল্লাহ্ যা করেন তা কল্যাণের জন্য করেন এবং আল্লাহ্ যেসব বিধান মানুষের জন্য নির্ধারিত করেছেন তা মানুষের জন্য কল্যাণকর এ বোধ ও সন্তুষ্টি আমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে আছে কি ?

ছ. কোনো অন্যায় ও পাপ কাজের সময় হৃদয়ে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় আমার মধ্যে জেগে ওঠে কি ?

ঞ. কোনো সৎকাজ করার সময় আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার পাবার আশা আমার মধ্যে জেগে ওঠে কি ?

ট. পার্থিব ধন-সম্পদের আমি মালিক নই হেফাজতকারী মাত্র। এ বোধ কি আমার মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল ?

ঠ. সৎপথে অর্জিত সকল ধন-সম্পদ শুধু মাত্র আল্লাহর নির্ধারিত পথ ও পন্থায় ব্যয় করতে আমি কি সক্ষম ?

ড. সকল সৎকাজ আন্তরিকভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় কি ?

ঢ. আচার-আচরণে আমি কি সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম ?

ণ. সকল কাজে মনেপ্রাণে আল্লাহর দয়া ও করুণার উপর ভরসা রাখতে আমি কি সক্ষম ?

ত. যে কোনো কাজ করার পূর্বে পাপ-পুণ্য তথা ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করার পর কি আমি কাজে অগ্রসর হয়ে থাকি ?

www.amarboi.org

থ. সৃষ্টিজগতের যাবতীয় রহস্য ও বিস্ময়কর দিক সম্পর্কে আমি কি চিন্তা-ভাবনা করে মৌলিক জ্ঞান অর্জনে আমার সময় ব্যয় করে থাকি ?

দ. ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের পরে অনন্ত এক জীবনে প্রবেশ করতে হবে এবং অবধারিত মৃত্যু এসে যে কোনো সময় আমার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে এ চিন্তা আমার হৃদয়ে প্রায়শই জেগে ওঠে কি ?

ধ. মৃত্যুর পর মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলিত হওয়ার আশায় আমি কি আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠি ?

উপরের নমুনা প্রশ্নাবলী কোনো গবেষণা লব্ধ জ্ঞান উৎসারিত নয়। সাধারণভাবে যেসব প্রশ্নের জবাব আমাদের আত্মোন্নয়নে সহায়ক হিসেবে গণ্য হতে পারে সেসব প্রশ্নাবলী এখানে সাজানো হয়েছে। এ ধরনের আরো সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী আমরা নিজেরাই তৈরী করে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে পারি। সব প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক হবে এমনটি নয়।

আত্মোন্নয়নের লক্ষে একজন বিশ্বাসীকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। নিজের নিকট নিজেকে জবাবদিহি করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারলে সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার চেতনা সৃষ্টি হয় না। অতএব পর্যায়ক্রমে প্রতি প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব পাবার জন্য প্রতিটি মানুষের উচিত চেষ্টা-সাধনা করা। সকল গুণাবলী এক সংগে অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একে একে সব গুণাবলী অর্জনের জন্য ধাপে ধাপে আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আত্মোন্নয়নের এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত বিশ্বাসী তথা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ আমাকে এবং অন্য সকলকে সেই তাওফিক দান করুন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন-(১-২০ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- কুরআন বুঝা সহজ
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- শব্দে শব্দে আল কুরআন-(১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- তাদাব্বুরে কুরআন-(১-৯ খণ্ড)
  – মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- সহীহ আল বুখারী-(১-৬ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- সুনান ইবনে মাজা-(১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শারহু মা'আনিল আছার (তাহাবী শরীফ) – (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- এহ্‌ইয়াউস সুনান
  –ডঃ খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর
- দারিদ্র বিমোচনই নয় যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি
  – মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ষড়যন্ত্র
  – আনসার আলী
- কুরআন হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা (জিনতত্ত্ব)
  – প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- প্রশ্নোত্তর
  – অধ্যাপক গোলাম আযম
- ইসলামী আন্দোলনের মেনিফেস্টো
  – মরিয়ম জামিলা
- আপন পরিচয়ে বিজ্ঞানময় আল কুরআন
  – মাওলানা মোঃ ফোরকান উদ্দীন নিজামী
- মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ
  – ইবনে সাইজ উদ্দীন